শূন্যকাল

It is not right that everyone should read the pages which follow; only a few will be able to savour this bitter fruit with impunity. Consequently, shrinking soul, turn on your heels and go back before penetrating further into such uncharted, perilous wastelands. Listen well to what I say: turn on your heels and go back, not forward...

Comte de Lautréamont

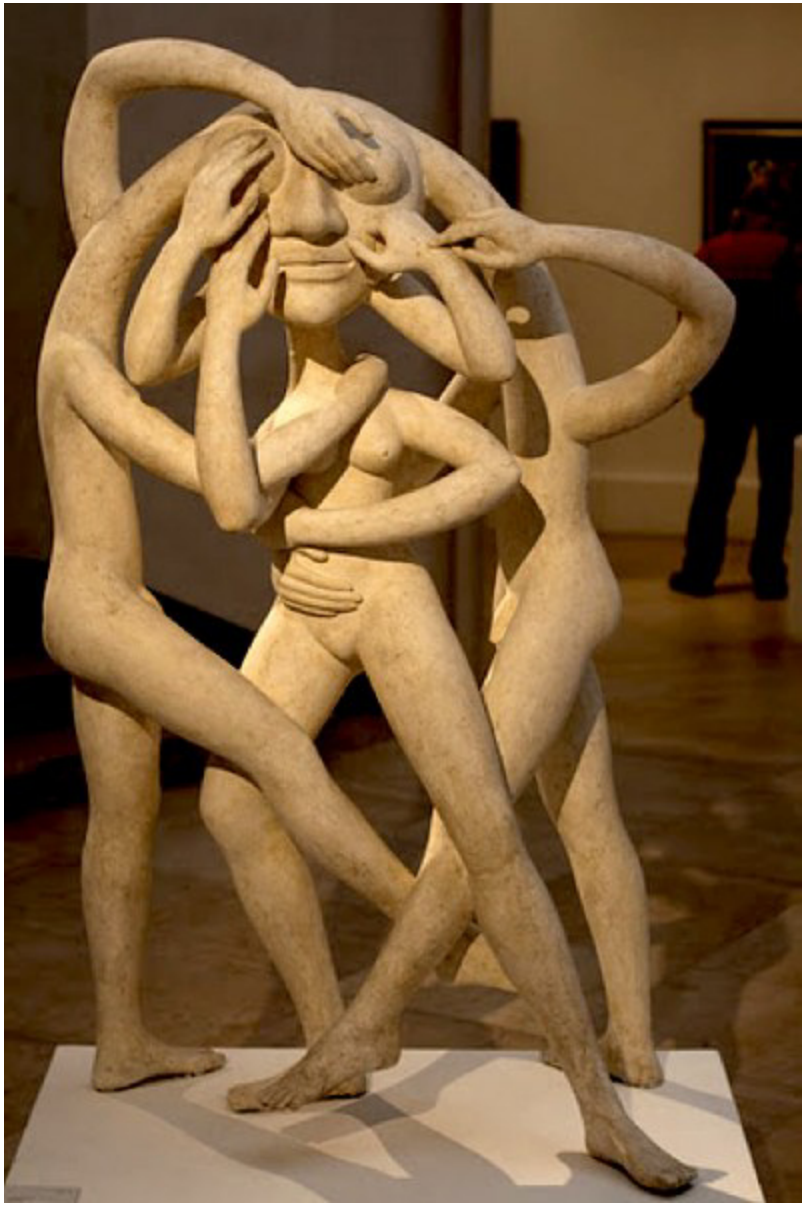

Issue: 5, April, 2014 * Editor: Dipankar Dutta * Email: deepankar_dutta@yahoo.co.in * Mobile: 9891628652 * Delhi

The spirit of life was in them: death can do nothing against the dawning light; death is but a cardboard mask soon consumed by fire. Behind the black flag - which is nothing other than an anti-flag - the garden of all possibilities is hidden, opening out infinitely to the sea.

মুখোমুখি বসিবার স্বদেশ সেন আর নেই আমাদের জীবনে।
কবির অনন্ত যাত্রার পথ করে দিতে মৃত্যুও হাজারদুয়ারী হয়ে ওঠে।
তাঁর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা।

এই সংখ্যায়

কাব্যডায়েরি

মলয় রায়চৌধুরী

কবিতা

বারীন ঘোষাল, অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাব্জ চক্রবর্তী, দেবযানী বসু, জপমালা ঘোষরায়, ইন্দ্রনীল বক্সী, অস্তনির্জন দত্ত, শ্রীদর্শিনী চক্রবর্তী, সব্যসাচী হাজরা, অলোক বিশ্বাস, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, পায়েলী ধর, ভাস্বতী গোস্বামী, গৌরব চক্রবর্তী, উমাপদ কর, দিলীপ ফৌজদার, রঞ্জন মৈত্র, ঋষি সৌরক, অভিজিৎ মিত্র, বিজয়াদিত্য চক্রবর্তী, তানিয়া চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল ঘোষ, উল্কা, রবীন্দ্র গুহ, কৃষ্ণা মিশ্রভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেনগুপ্ত, পীযুষকান্তি বিশ্বাস, সুমন মল্লিক, শুভাশিস ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর দত্ত

কাব্যডায়েরি

মলয় রায়চৌধুরীর
নির্বাচিত পদ্যনামচা

২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

লেখাটা পড়লুম তোর খোকা । যাকে তুই স্ল্যাং বলে ভাবছিস
ওগুলো সবাই বলত মা- বাপ- দাদুর সঙ্গে বুকনি- বুলিতে
আমাদের ইমলিতলায় । জানি তোরা বুঝতে পারবি না ।
ঘটের ভাগাড়ে শুধু তোরাই আছিস মনে করে
আমাদের ভাষাটাকে স্ল্যাং বলে চালিয়ে দিচ্ছিস ।
তাই তোকে বরাদ্দ করলুম আজ ইমলিতলার
কয়েকটা প্রিয় দিলফেঁক । আদ্যাক্ষর চয়েসটা তোর
অ আ থেকে ক খ হয়ে চলে যা চাঁদের ফুটকিতে
প্রতিটি অক্ষরে পাবি পছন্দের ইমলিতলা- বুলি

২০ ডিসেম্বর ১৯৪৯

একাই যাচ্ছিস চুষে, আমাদেরও চুষতে তো দিবি
চোষ না ওদিক থেকে আমি এইদিকটায় চুষি
আর আমরা কি ফ্যালফ্যালে মড়া, দেখব তোদের দুজনের

চোষাচুষি ? কথা ছিল সবাই পারাপারি করে চুষব মনের সুখে
তা নয়, বাঞ্চোৎ, তুই তো একাই চুষে ইন্দ্রের সভায় চলে গেলি
ঠিক আছে, চোষ চোষ, এঁড়াচ্ছিস কেন ! গরিব হবার কত মজা দ্যাখ-
একটা আইসক্রিম আমরা পাঁচজন মিলে আনন্দ নিচ্ছি চুষে

৪ মে ১৯৫৩

আজ এই গরমের ঘুমের দুপুরে তুই কেন এলি
মুণ্ডুহীনা ? তোর কেন মুখ নেই ?
যে কোনো দিনই তুই এসে যাবি এই ভেবে
স্টক খালি করে দিই রোজ । তবু এলি
বুক নাভি আর মোদো যোনির আগাছা নিয়ে
তোর ম্যাজিকের জেরে দিনের বেলায় দ্যাখ নাইটফল হল

১৯ মার্চ ১৯৪৫

রাস্তায় পড়ে- থাকা ছায়ার লজেন্স তুলে, আরেকটু হলেই
পুরতুম মুখে, নাঃ, মনে পড়ে গেল বাবার বারণ, পথের ধুলোয়
তেচোখো পরাগি দেবী- রাক্কুসিরা রেখেছে ঋতুজ ফেলে, তাতে
আসক্তি ফাঁদের বিষ, সেঁকো বা গণিতে নির্জ্ঞান, বিশেষত আজ
আজকে তো রবিবার
ঝোলানো পাঁঠার মাথা পাবলিকের রোগন বব্বর
মাংসের নলি থেকে ঘাসের বাদাম- গন্ধ কাঁসার পরাত ভরে
বিলোবে জেঠিমা ; তাই তোলা হলনাকো
ঘেঁটে- যাওয়া স্মৃতি ; যাক পুড়ে থুতুর আরকে ভিজে
আরেক হুল্লোড়,হ্যাঁ, আজকেই
মানেগুলো ঠেলে- ঠুলে ফেলে চলে আসবার দিন

৬ জুন ১৯৯৬

রগে রক্ত উঠে এলো অটোয় আমার পাশে ফর্সা যুবতীটি
বসতেই । সুশ্রী, সন্দেহ নেই, তবু ক্রোধ হল, কী আশ্চর্য
নারীর স্পর্শ সহ্য করতে পারছি না । হরমোনের তেতো ঘাম
চাপা দেয়া দামি পারফিউম যদিও মেখেছে
তবু ওই যৎসামান্য সোঁদা ভিজে ফোঁটা শোনা না পর্যন্ত
'বাঁদিকে রাখবেন' । মেটেল জেলের ফেঁসো কানাচের জাল
রক্তচাপ না- কমা পর্যন্ত
ওষুধের বড়ি ঘিলুর গেঁজেলে নেমে যতক্ষণ
নম্র কচি নিয়ে নিয়ে ভাসে
দিনটাই অনিষ্ট করে দিল ওই মাংস- কুলকুলে তিরিশিনী

১২ এপ্রিল, ১৯৯৫

কেন ? কানে লাগাবেন তো শোনার মেশিন
এ- বয়সে, সত্তর পেরিয়ে, ওটুকু শোনাই
যথেষ্ট কি নয় ? টিভির ভল্যুম টিপে বাড়ালেই হল ।
"ওদের, ছেলে- বউয়ের, চাপা- গলা ঝগড়াঝাঁটি
শুনবো কি করে ? এর চেয়ে
ভালো শোনা যায় এরকম শ্রবণযন্ত্র কিনে আন ।"

২৭ মে ২০১৩

কিনতেই হল, বাগুইআটির মাছের বাজারে
আটশ টাকায় পমফ্রেট জোড়া, তাও আধপচা
পেটের ভেতরে নেমে খুলল রুপোলি
খামচের ঢেউ তুলে জজসায়েব
হেঃ হেঃ আমরা দুজনে আইন তোয়াক্কা করে
তিনশ সাতাত্তর ভেঙে সাঁতরেছি
প্রশান্ত সাগরে, মাছের বাজারে মটকা মেরে

পড়ে আছি বলে ভাবলেন জোড়া মানে
পুং আর স্ত্রীং

৯ আগস্ট ২০১০

রিভলভিং বার থেকে সিঁড়ি বেয়ে মাতাল যুবতীদল
যথেচ্ছ গালমন্দ করে যাচ্ছে ইংরেজি ভাষায়- -
ঢ্যাঙা কালো চুল খোলা যুবতীটি আদুরে গলায়,
"ফাক ইউ, ইউজ হিন্দি অ্যাবিউজেস, দে হ্যাভ
মাচ মোর মিঠাস" , আমার পাশ দিয়ে হুড়মুড়
মেয়েদের ঠোঁটে : মাদারচোদ, ভোঁসড়িকে জনা,
চুতিয়া সালে, গধে কা লন্ড....ধনী মেয়েদের মুখে
মদের গন্ধও বেশ পালটে গেল ওঙ্কারের নবীন খিলখিলে- -
দিনটা ছিলই তাজা রাতটাও আজ ভালো যাবে ;
বলতে পারতো তবু, "রাস্তা ছাড় বুড়ো বোলডার,
দেখতে পাচ্ছিস না কি নেমে আসছে মেঘভাঙা নদী "

৩ জানুয়ারি ১৯৫৫

আনাড়ি শিবাঙ্গ নয়, চলে গেল প্রথমে তর্জনী
কোনখানে কোন দেশে কত বার চুঁয়ে
মহাপ্রস্হানের সোঁদা অলিতে- গলিতে
অর্জুনের মধ্যমা- তর্জনীতে ধরা তীরের রোদ্দুর
তারপর যতবার প্রয়োজনমতো
রসশাস্ত্রে মজে- যাওয়া গূঢ় অলঙ্কার
প্রথম তবুও কিন্তু প্রতিবার প্রথমই তর্জনী হবে
উৎসারে নাতিতাপ কাঁপুনির হাসি
টিপ সই করে যাবো করে যাবো করে যাবো
করে করে করে করে আজকের পর

১৯ জানুয়ারি ১৯৫০

ব্রিং ইট অন : দুআনা পুরিয়া
ব্রিং ইট অন : চারানা পুরিয়ে
ব্রিং ইট অন : আটানা পুরিয়া
পোস্ত- কুঁড়ির বীর্য চ্যাটালো ধোঁয়াট
ক্রিউকাট বয়ঃসন্ধির এই পারে
সাড়ে বারোটায় আজ
চুকে গেল স্বকীয় রাত্তির

২৮ জুলাই ১৯৫৯

সিঁড়ির পাকের শেষে, বলল পিসতুতো দাদা
"এই হল সোনাগাছি, ফিরাত্তিরে পাঁচ লিটার
লিকুইড খোকাখুকু জমা হয় এ- পাড়ায়,
মাসিকে বললেই তোর যাকে চাই
এখন তো চুলখোলা মেয়েদের বর্ষার দুপুর
সকলেই ফাঁকা, হাফ রেটে দিব্বি পেয়ে যাবি"
'ঘরে নয় বিছানায় নয়, চলো না বৃষ্টিতে ভিজি
প্রেমিকার অভাব মেটাই', বলি কালো মেয়েটিকে
চুড়িদার শ্যামলিনী আর আমি হাত- ধরাধরি করে
আহিরিটোলার ঘাটে বৃষ্টির গঙ্গায় নামি- -
ও হয় ফোলানো পালের নৌকো, দোল খায়
আমি হই লগি- ঠেলা ভাটিয়াল মাঝি
"আবার এসো কিন্তু, অ্যাঁ, প্রেমিকা ভেবেই চলে এসো,
যেদিন পড়বে বৃষ্টি, ভেতরে তো ভিজছি না
বাইরের ভেজবার রোগটুকু দিও।"

২৬ জানুয়ারি ১৯৬২

খেতে বসে সুনীলদা, মানে সুনীল গাঙ্গুলি
মুগের ডালের সাথে ভাত মেখে জানতে চাইলেন :
'গণ্ডুষ করছ দেখছি, মন্ত্র কি জানো ?'
থালার ডানদিকে মাখাভাত বড়ি দিয়ে, গাই
'জিঙ্গল বেল জিঙ্গল বেল জিঙ্গল অল দ্য ওয়ে. . . '
আজ থেকে যুদ্ধ শুরু হল ।

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫২

পৈতের সমিধ সাজিয়ে, বললেন পুরুতমশায়
'এটা দেখছ, যাগযজ্ঞে খুবই জরুরি
ওই যে তোমরা যাকে বলো, বুলশিট
মানে ইয়ে..., ষাঁড়ের গোবর ।'

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

'সি এম জিন্দাবাদ' নিশিডাক ; পিছনে ফিরতেই চিৎকারকারী
সাবর্ণভিলার ছায়াছ্যাঁদা সিংদরোজার চৌকাঠে
ছোরাটা ঢুকিয়ে দিল খুড়তুতো ভাইয়ের পেটে !
"সি এম ? সি এম ?" গলিটা দৌড়োয় দুদ্দাড়
'না, না, মুখ্যমন্ত্রীর জয় চায়নি গো, পালাও পালাও'
ছলকানো আতঙ্কের ঘড়া ফেলে ন্যাতাদঙ্কা খাওয়া- পরা মাসি- -
লেংচে ছুটতে গিয়ে খালিপেটে বমি করি তলপেট চেপে
যাবতীয় তত্বের কস্তাপেড়ে থুতু : অস্ত্র কি মিসানথ্রপিস্ট
গামছামুখ ছুরি ছোরা ন্যাপালা ভোজালি বোমা বন্দুক ?

আজকে পেলুম টের উর্ধশ্বাস বুক থেকে নয় । চিতাবাঘ গতি
ঘিলুতে জীবাশ্ম সেজে আলোর গণিত নিয়ে টুঁটিটিপে নামে :
'সি এম তো চারু মজুমদার'

১১ আগস্ট ১৯৮৫

বাঁশে চারথাবা- বাঁধা চিৎ মরা বাঘিনির ঘুষঘুষে বুকে
শুয়ে পড়ি উপুড় উলঙ্গ ঘ্যামা ওল্ড মঙ্ক অন্ধকার মুড়ে
বাঘিনীর মাইএর বোঁটা মুখে কান্না পেয়ে গেল
চুষি একে একে আর ফোঁপাই ফোঁপাতে থাকি
কেঁদে কেঁদে ফোঁপাতেই থাকি রাতভর. . .

২৯ অক্টোবর ১৯৫৩

শেষ হল গানের আগুন আজ পেটরল ঢেলে
চার টেনশান- চাবি আছড়ে বেয়াড়া বেহালার
ধোঁয়ালি চিনচিন তারে হেঁয়ালি মূর্খের
নিঃসঙ্গতা, কাঁদুক ভলকে হল্কায়
দাউ- দাউ ব্যর্থ বেসুরো বিফল ফিডলার
পুড়ছে পুড়ুক শালা চর্বি ফেটে বেরুকগে কচলানো ধোঁয়া

৩০ অক্টোবর ২০১২

আছড়ে কেলিয়ে পড়ে গেল আজ আশি বছরের মহীরুহ
প্রতিষ্ঠানের রেডউড ; গলগণ্ড শোকক্যালা পরগাছাসহ
খোকাখুকু উইপোকাদের কাঁধে চলল ক্যাওড়ায়

শুরু হল সবুজ শতক জুড়ে শিশিরে রোদেলা হুল্লোড়
ঘাসফুলে বুনোবীজে দুর্দম হাত- পা ছড়ানো উদ্দাম
অবশ্যি এরাও জানে শিগ্গিরি আলো- হাওয়া চাপা দিয়ে যম
উঠে যাবে আরেকটা রসচোষা গদাইলস্কর ভুঁড়ো ডেডউড ভাম
চুষে খাবে ওদেরই মাটির গন্ধ কচি- তাজা সুখের স্বাধীন
যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন কাশফুলে মুথাঘাসে দুর্বাদলের শিষে
মৌমাছি প্রজাপতি ফড়িঙেরা গেয়ে নিক ফাকিউ ফাকিউ সুরে
ফাকিউ ফাকিউ ফাক ইউ ফাকিউ ফাকিউ ফাক ইউ

১৩ জুন ১৯৫২

কাঁপছিস কাঁপছিস কিছু তো করিনি
তোর মা তো টিউশানি শেষে বিকালে ফিরবেন
ইঁদারা ছোঁয়ানো সেক্সি হুইসপারিং কানি
ফাঁকাবাড়ি বাথরুমে শাওয়ারে বৃষ্টিনাচ
হরিণী চিবিয়ে খায় কুমিরের রগরগে মুড়ো
মাংসখোর নাভিজলে ধনুষ্টঙ্কার
ইডিয়ট, অর্গাজম হয়ে গেল অর্গ্যাজম আজ- -
ব্রাভো অক্ষতকেষ্ট জিও মেরে অক্ষতভৈরবী

৯ জুন ২০০৯

বালির ওপরে সারসার নিপোশাক তরতাজা শ্বেতাঙ্গিনীরা
দেখব কি দেখব না দেখব কি দেখব না
দেখি দেখি দেখি দেখি দেখি
চোখের কোঁচড় খুলে ফ্যালফেলে অ্যানাকোণ্ডা জিভগুলো ওড়ে

উলঙ্গ রোদমাখা শ'খানেক মেমযুবতীরা শুয়ে আছে
হল্যাণ্ড সাগর- তীরে চ্যাটালো গোলাপি নাভি
ওথলানো ঢেউপদ্মে ফোসলানো কুঁড়ির ঝিলমিল
বিদেশভ্রমণ এসে আমার বাদামি ত্বক
অ্যাপারথেইড ছিঁড়ে খুলে দিলো মগজের পাক

২৮ এপ্রিল ১৯৭৫

আমাদের সাবর্ণভিলার, নোনাঝুরো খণ্ডহর
আত্মহত্যা করে নিল আজ
কাছারিবাড়ির তিনশ বছরের নীল অন্ধকার
ঝুলছে নিঃসঙ্গ একা নতুনকাকার মেয়ে পুটি
বেঁধে গিঁট জামদানি শাড়ি

বারীন ঘোষাল- এর কবিতা

রংরং করা রঙীন বনের কয়লা ফিউচার

হাতের ছায়া দেখে বলোনা যুবতী সে কিনা
ছায়ার সঙ্গে দোস্তি করে শির শির রিপিট হল কেন
আলো ছড়াবার মজায় এল কাচের বোল

তবু তা দুখীর মজা
সুইচ খোঁজে
গায়ের বোতামে কারখানা তার রং বরং করছে
গ্লোব ঘোরাতে ভালবাসে
আর যেতে যেতে আলো ছিঁড়তে দুপাশের
রঙীন হয়ে যায় পান্না পলাশের পাশে কাচের চুড়ির টুনটুন তাই

কাচ কারখানা থেকে বেরিয়ে আসছে কালো মুখের মেয়েরা
ঘরের মুদ্দা নাদেখা কয়লা খাদানে কোলাজ করা বাতে বাতে চিৎ
হরবোলে কেমন গজব লেগে গেল
ফোটা ভাঙার গল্প জানে না উহারা

তপ্ত আগুন
শব্দে নাকাল
ফুঁয়ে মুখ
মুখ ফুলিয়ে চলে যাচ্ছে বাড়ির মেয়ে

যেন একটা হমদম মরণ
একদৃষ্টি
জোড়া চোখ
ত্রিনয়ন
বসে বসে ঘাস ছিঁড়ি আলো ছিঁড়ি বাল
রঙীন হয়ে যায়
মন ছাড়া সমস্ত রঙীন হল কী দোষে

কয়লা আর খাদানের মাঝে চাঁদের বেসরকারি ম্যাপে শামিয়ানানো মজুম জুম জাম তাম শাম
তার দিন দুপুরের তলায় বসেছি
আসলে পেয়ে বসেছিল মোহম দারুটি
চারপাশে তুড়ি তুর্কি আলো হয়ে গেছে মন্তরে
কিম্‌চাঁদনীর খোয়াই ভেজায় হাজার চাঁদের বংশতি
সজল কাঁটা তোতলা চাঁদের অভিনয় টুটি ফুটি রোদ অ- মন মনোবেড়ি
খতের চিঠি চিঠ্‌ঠি আস্তে স্তেকার
পথের পাস্ট টেন্স হয়ে আছে শোনার পরেও আমি তাদের ছেলেপুলে বলে ডাকি
রিল গড়ানো বিন্দু বিন্দু ডিজিটাল মুনিজ্‌ম্‌
এই চাঁদবাদে এবারের জ্যোৎস্নান
রচনাটি রচিত তার মধ্যে
চোখের শাটারে হিমানী এক্কেবারে ওম উদোম হয়ে যাই
ফটাফট স্টিল ছবি সেঁটে এক কোল কোলাজ কারখানা
লাজের জলে অ্যালবাম জোড়া হারযোনিয়াম
বেলা বাড়ে আহা রে সে তু রে হেই হুয়া হেই হুয়া কি নাম যেন
ধুধুম কিনা ধুধুম কিনা
ফিরে এলানো বনশ্রীকাতরে

ম্যাপের তলায় বসে দেখি গাছ ফুল পাখি নদী স্তন খিদে এমনকি জোছনা ছিল না

বন থেকে কয়লা পর্যন্ত হাঁটার ইচ্ছেটাও নেই
কাট পেস্ট জুম করা মন্তাজ মনে এই বাংলা কবিতানা

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়- এর সাতটি কবিতা

শহর

পোষা বুদবুদগুলোর কি হবে?
সারা বিকেল রান্নাঘরে চামচ সাজানো হল

অপরিচিত

অপরিচিত চুল্লি এভাবে প্রাক্ গ্রীষ্মে সুবিমল
ডুবুরির প্রশ্নে আমারই উপন্যাস অনুমান করছি
নইলে শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়- এর বঙ্গীয় শব্দকোষ থেকে
কৃতানুতাপ, এই শব্দটা পেলাম কিভাবে

দীর্ঘাঙ্গী রক্ত দুখু ও জোরালো
টারজান রঙের গন্ধ যেমন হয়
রকেট লঞ্চারের মতো টানটান, হাইওয়ে
যেখানে আনাজভর্তি একটা রিকশা নিয়ে ফিরছি আমি, আশেপাশে শ্রীহরিচরণ

বেড়াল

মৃত'র সাদারা প্রধানত আমার দিকে আসা বেড়ালের লাফ
পরিত্যক্ত পরীক্ষার চামড়া কাঁধে নেবার কারণ
মাথাকে যখন বিশ্বাস করা হচ্ছে পা দুজনকেই বন্দুকের অনুভূতিতে ছোঁবে
এভাবেই বেড়ালের উথলে ওঠা মাংস আমার সহ্য
শতকোটি ঝাঁঝ ও রন্ধনবিদ্যায় সুপারঙ্গম গাছের
ইল্লত তো খেয়ে নেয় গাছ
কথাবার্তা উপস্থিত করতে চেষ্টা হয় কোনো কোনোদিন
লবণের লোহা তখন লবণের দিকে দৌড়ে যায়

মাংস

পর্দা ছাড়া আর কে হরফগুলোর ওপর বাড়ির তাপে নুয়ে থাকবে?
কেউই পাখির খানিকটা উপস্থিতি না- ছাড়িয়ে মাংস পাবে না
ওয়ার্ডরোবের ভেতরে রাস্তা ভুল করছে আঙুল
আঙুলের ওপরে তাঁত খুলছে শাড়ি

রণেন রায়চৌধুরী

শিহরণ সহজে জাগিয়ে রাখা স্তূপ
মেদ ও দুঃখ ঠেলে সর্বমাস ফেব্রুয়ারী
রণেনবাবুর সুফী ভেদ ক'রে যে বাঙলা আসে

চাদর ঝাড়তে গিয়ে কররেখা কররেখা কোথায় ঢুকেছিস
শ্বাস ও নাদ নিয়ে মৃতের ভেতরে চলাচল করছে বাধ্য কার্তুজ
সংকেত বোঝার জন্য মুদ্রায় দাঁড়িয়ে পাগলও বড়ো হয়ে উঠছে
জিভ ও কিছু সুতোকে আমার মনে হয় দ্বিধান্বিত শান্ত
দাঁতের ফাঁক থেকে ইচ্ছে করে, তোমার বাড়ি যাই
গিয়ে রান্না করি বেগুন ভর্তা রুটি

ঘোড়া

ঘোড়া ভর্তি রাজা জ্যোতির্ময় ঝংকার নিয়ে ভালোবাসছে
ভালোবাসার আয়ুর্বেদে লালগামছা
তাতে বৃষ্টি পড়ছে বৃষ্টির জল জমছে বেয়ারার মধ্যে মানুষের মধ্যে
ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে যে দোকান ব'লে ফেলতে পারে মেয়েটি সমুদ্রে বেড়াতে এসেছে
তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মদ তার শাক্ত ট্রেনের ঘষা আশ্চর্য
আর সে আয়নার বদলে তৃণভূমি সেমিকোলনের বদলে সংগ্রহ করছে প্রাচীন শহর
এই অগ্রজ হলুদ থেকে যে শীর্ষচাপ ফিরলো- না ব'লে কষ্ট হল না
তাকে পুনর্বিবেচনার স্বল্পদৈর্ঘ্যের সেদিন দিচ্ছি

কুয়াশা

কুয়াশার সত্যিকথাগুলো ভ'রে গেছে নভেম্বর বিপ্লবের ডিসেম্বরে
একমাত্র তোমরা ভাবলে কবিতাটা এখনও বাকি
হয়ত খালি গায়ের লেখার ভেতর থেকে হুইস্কি ঢালছি আর
ভিটামিন টের পাচ্ছে মানুষ কতটা বড় হ'ল
মানুষ। বৃষ্টি বুঝতে গিয়ে ঈশ্বরের মূল গল্পে প্রবেশ করেছে

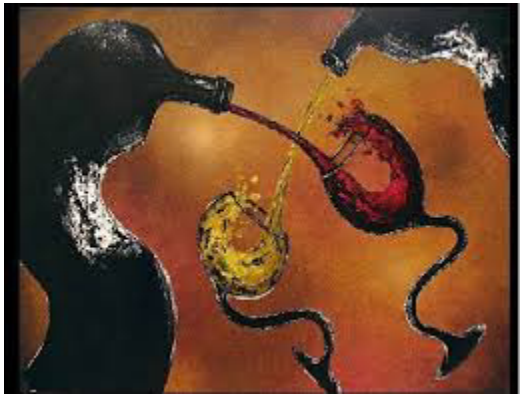

নীলাব্জ চক্রবর্তী- র দুটি কবিতা

বাই বাই সার্কাস

তুরুপের ম থেকে ম- কার থেকে একটা ফিনফিন উড়িয়ে দেওয়ার কথা। ঘন হয়ে আসা পরবর্তী মিডশট। আপনি আর আপনারা। আয়না ভাবছিলেন। ডাবল রোল। অনুষ্কার গায়ে ছুঁড়ে মারা বালিশ চতুর্থ দৃশ্যে ফিরে আসছে অনুষ্কার অ্যান্টিম্যাটারের গায়ে। ম্যাজেন্টা বাউন্স অত স্বাদু ছিলো? পারদ সরে যাওয়ার পর খুলে পড়ছে গল্পের বিজ্ঞাপনী লুপ আর দ্যাখা যায় নভেম্বরের করিডোর জুড়ে একটার পর একটা বাই বাই। সার্কাসের আস্তিন থেকে গড়িয়ে যাওয়া হাফ- ডে রাস্তা পার হচ্ছে. . .

ভাষার ভেতর দিয়ে

কয়েকটা সিলিকন রাস্তা পার হচ্ছে। ভাষার ভেতর দিয়ে পড়ে যাওয়া রাত দেড়টার কফিশপ। মোনোক্রোম। তেরছা হয়ে আসা। রুটম্যাপে যতটুকু মেথডোলজি পড়ে আছে তার গুণ। ক্যালেন্ডার উপচে সফেদ পঙক্তিমালা। কাঠের গন্ধ পেরিয়ে আসার নাম আমরা স্মৃতি রেখেছি। লিখে রাখা। কোথাও একটা বাতিঘরের উপমা বেজে উঠবে। একটা ফিকে হয়ে আসা মুভি- ডে'র হাড়গোড়।

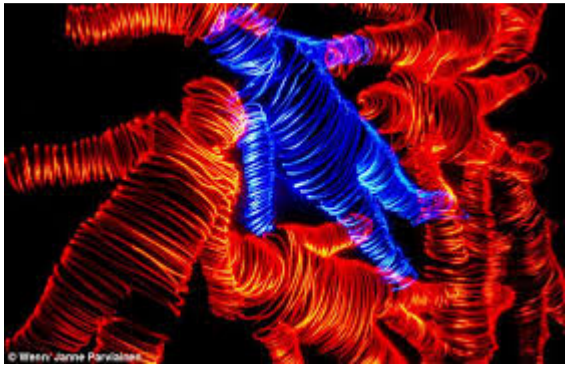

দেবযানী বসু- র তিনটি কবিতা

কবিতাঃ লাভ ইন আ হিস্ট

স্যানিটারি পায়খানার শাসনে পেয়ারা কুল অথবা ফলসা গাছেদের প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি । ওখানে মোবাইলের মেঁই ক্যাম্প, নিম্নতম কর্মচারীর কাঁধে ভর দিয়ে সকাল দুপুর বেঁচে থাকে। মোবাইলের পাগল ঘণ্টি সবাই শোনে । ১টাকা প্রস্রাব / ৩ টাকা পায়খানা . . . মুকুট মনিপুরে নিজের মুকুট হারানো সেই প্রথম বার গণ বাথরুমে . . . রবীন্দ্র গুহ অথবা সমীর চৌধুরীকে এ গল্প বলা হয় নি । নেগ্রিটো পায়ের বিচরণশীলতায় স্বচ্ছতা . . . সিংহাসনে মানিয়ে যায়. . . মুখের না না টা ধরবেন না . . . এক বারকোশ ভরা ফলের সাবধানতায় মামুলি ভুল মিশেছে। কি প্রতীকে ধরে রেখেছি ভাবতে ভাবতে জুয়াজীবনের প্রথম টিকিট ভেসে ওঠে মোবাইলের পর্দায় ।

আপ্রাণ কান্নায় ডাবের জল ডাব ফাটিয়েছে । জিন্দালাশ ভয়ে কাঁটা হয়ে আমি বাঙ্কারের স্মৃতি নিয়ে । দরজার আল্পনা গণ্ডীর শাসনে রাখে ।

উপরোক্ত কবিতাটি সম্পর্কে কিছু বুদ্বুদ ঃ প্রথম বগি

কেন সব বলে দিয়েছি বলে ধমক এল। বাড়ির যাবতীয় বালিশের ভেসে যাওয়া সমুদ্রে . . . হারাতে হারাতে সাঁতারের বেল্টটাও হারিয়েছি সাম্প্রতিক । কতো ডোজ কাঁদতে হবে প্রেস্ক্রিপ্সানে লেখা . . . সম্পর্ক খারাপ হয় হরপ্পার মাটি মেখে । একটা সময়ে এসে দেখি ছবি ফুরিয়েছে ।

ঘটনা ১- বিড়ালটাকে তাক করে এয়ারগানে লবঙ্গ ছুঁড়েছি বিড়ালটা কেমন ছুট দিল . . .

ঘটনা ২- শুধু কাঁদবো বলেই আজকাল হাতের মৈথুনমুদ্রা. . .

দ্বিতীয় বগি –

মৌলিক বিশ্বাসগুলি মৌলিক সংখ্যা – কিছুতেই আর ভাঙা যাচ্ছে না । বয়াদের স্থির অবস্থান মৃত জাহাজকে ঘিরে. . . মরণহীন অনশন . . . . . S- পথ ধরে বিপদ এলেই ভরসাপ্রবণ মোবাইলটির সমস্ত নং অদৃশ্য . . . তার কালো স্ক্রিনে চক দিয়ে প্রিয় নাম লিখি . . . . . আর লিখি. . .

ঘটনা ১ – খাবার শেষে বাটি ভরা মুখশুদ্ধি রুমালে ঢাললাম ওয়েটারের সামনেই।

ঘটনা ২ – বিকেলের আলোয় উষ্ণতা চোখ মেপে নিল লেখার শেষে ।

খবর পাতার রুমাল

আকাশের নীলে ফাঁকি পড়ছে আজকাল। পলাশ ফেটে রক্ত ঝরছে গাছের গা বেয়ে। পাঁচ সেমি নিউজ হলে চার মিনিট অ্যাঙ্কারিং. . . মিলে মিশে প্রসাদ চড়ছে চৈতালি ভোটের স্বপ্নে. . . এক দেশলাই বাক্স থেকে ভোট বাক্সে যেতে মা ঠাকুমার সেলাই বাক্স আর কাজে লাগে না । এখন অহোরাত্র গাছেদের গাছালিপনায় মুগ্ধ আমি । কাঁটার মুখে ধরলেই ফোঁড়া সহ শরীর গলে যায় । সেবন্তি তুলসির গায়ে প্রচুর রেফ . . . রঙিন আতশবাজি খেলে উটেরা উঠোনে গজানো রেফ খেয়ে যায় । আমি তাদের মুখ খবর পাতার রুমালে মুছে দিই ।

পেশাদারিত্ব

বাংলার লুঙ্গিপরা মোমবাতি কু – লুঙ্গিতে অ্যাফেয়ারই টেলস সাজিয়েছে ।

যাবতীয় খাবারে নাক সিঁটকাই. . . নাক শুকিয়ে শুঁটকি মাচ. . . দেখি কাজের

মেয়েটি ভাড়াটে আর তাড়াটে বিচ্ছিন্নতায় ক্যালসিয়াম খায়. . . মৎস্যপুরুষের লাখা সন্তান চাই তার. . . অশুদ্ধ রক্ত ঘুরপথে সাপখাওয়া সাপের বাঁশি কেড়ে নেয়।

সুসভ্য মরুর শীত ঘাসের অপেক্ষায় নেই আর। এক মনিটর ভরা বালিরেত. . . দাঁতের স্বয়ংবরা রূপ বার করে আনি মরুমাটি খুঁড়ে । এরপর সুনাম ছড়ায়। হাসিনীর আস্থা বাড়ে . . .

জপমালা ঘোষরায়- এর দুটি কবিতা

শূন্যকালের কবিতা

শুধু সেলাই করার সময় লক্ষ্য রাখুন সুতোটা আছে কি না ।

শূন্যকালকে জুড়ে দিচ্ছি আবহমানকালে জোড়াতালি বকওয়াশ অবিন্যাসে। শূন্যকালি দীপঙ্কর দিল্লীওয়ালা দিলীপ ফৌজদারদের জন্য আবার সাহস করে ফৌজদারী ফাঁসে পড়া হরেকমাল একদাম শব্দগুলো. . . প্রত্যন্ত

গালাগালি গলাগলি গলিগলির মধ্যেই ডাল গলানো ও মাথা গলানো।

বদলে ফেলাটা একটা দুঃসহ চুলকানি রবিঠাকুর থেকে রবীন্দ্র গুহ সবার ছিল। বদলামি আর বোতলামির মধ্যেই যাবতীয় আবেগের তরলীকরণ সরলীকরণ হাপিসিকরণ তো সুনীল - শক্তি - মলয় - সমীররাও করে গেছেন। বদল- বদলা- বোদলেয়র সব আবহমান এই চত্বরেই, যেখানে আপনি বসে আছেন, আবার বছর ২০ পর এসে দম- মারো- দম সিঁড়িটাকে আপনি যদি খুঁজে নেন তখন জানবো আপনার হৃদয়ও ঘা - আ- স. . . . . বিকেলের নক্ষত্র - অ - অ . . . . মৃত কবিতার শব ব্যবচ্ছেদ . . . . ফরেনসিক . . . . মৃনালিনী ঘোষাল. . . .

বিনিসুতোর মালাটালা ভাববাদ মতবাদ মদবাদ সরিয়ে রেখে সেলাই করার সময় লক্ষ্য রাখুন সুতোটা আছে কি না। সব চা- ওয়া এবং চাওয়া, পা- ওয়া এবং পাওয়া এবং পাওয়াই বোহেমিয়ান. . . আবহমান. . . উড়নচন্ডী . . . উড়মান. . . উড়ালপুল. . .

তালব্য ' শ' মার্কা একটা বিড়াল রাস্তা কাটলো। আমি কি রাস্তায় থুতু ফেলবো ?

এই সবই কবিতায় লিখছি। শুকনো পাতাগুলো কোনো কোনো বাইকের পিছনে বর্তুলগতিতে কিছুটা গিয়ে ' হাই হৃতিক' বলে ফিরে আসছে বিপরীত দমকা হাওয়ায় . . . . . টিনএজার দেবদারু ঝটকা মারছে সুঠাম ইউক্যালিপটাসকে. . . কৃষ্ণচুড়ায় নব্বই দশকের আগুন আর রাধাচুড়া আশির দশকের চেয়েও পরিণত হলুদ . . . এরাই জারণে রাখে আমাকে এবং জাগরণেও।

এইসব ছোটছোট সঙ্গম আর দীর্ঘতম প্রেম. . . use and t hr ow pen- এর নিহিত ক্ষণবাদ আমি যে কাকে দিয়ে যাব ! আর্থিক দিয়েছি যেখানে পরমার্থিক আরও বেশি, বিনিময়ে ভাঁড়ে মা- ভবানী।

শালবাগান মিনিবাস কোনো শালবাগানে যায় নি কোনোদিন . . . . . অথচ আমি তার চাকার শব্দে পর্ণমোচি

পিয়ানোর কসমিক সাউন্ডে শুনতে পাচ্ছি কবি অলোক বিশ্বাসের অতনুর নামগন্ধ . . . . .

ইন্দ্রনীল বক্সী- র কবিতা

কাফেলার দিন

চেয়ারে সেঁধিয়ে চলেছি লোমোশ নিপুণতার লেশমাত্র নেই
ফুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে সামান্য যেসব বাহারি কথাবার্তার রুমাল
দোষপেটানোর মতো মেশিনে কালো ঢুকিয়ে ভেংচি কাটছি

ঝুলিমাখা বেড়াল চলনে হেঁটে যাচ্ছে নির্লিপ্ত উটের শহর

...গ্রে স্কেল থেকে অন্ধকার শুষে বাদ দিচ্ছি জুলাই
এ মাসের রাত ততো গভীর নয় কিছু কিছু দিন শুধু
ব্যথারা সয়ে গেলে আদর পরে থাকে
ইচ্ছেগুলো শুকিয়ে ওঠে প্রজ্জ্বলনপ্রবণ

শান্ত হতে বলছো
কিন্তু এই বদ মেজাজের কি করি
তোমাকে কি বলি

এভাবে গল্প এঁকোনা অনুচ্ছেদে আটকে যাবে
...বরং এস এম এস করো সেই ভালো
বা পরিচিত রিং টোন
কিছুটা নিরবতা রেখো পাশের বালিশে

বালিরা রাস্তা হয়ে গড়িয়ে রয়েছে বিস্তারে
...তিন দিন তিন রাত ক্রমাগত পার হচ্ছি
অজস্র গুহা শুকনো টিলাদের চেনাদেশ
অন্ধকারে রঙীন মেহেরবান শুধু
তাঁবুদের শ্রেণী ক্যাশকার্ড রইল কিছু কিনো
অনেক আদর রাখছি. . .

একটা চুপমতো সকালের প্রয়োজন ছিলো
কোন সাংসারিক শব্দকল উঠে আসবেনা
রোদেরা জ্যামিতি শিখবে বারান্দায় কার্নিশে
যেমনটাকরে শেখেনি কাগজ ও দুধওয়ালা ছেলেদের সকালফেরি

যেমনটাকরে বালি পেরিয়ে শহরে শহরে উটেরা আত্মমগ্ন সকালের নিউজপ্রিন্ট খালি পরে থাকে সমার্থক
শব্দকোষে বেছে বেছে নাবাল এলাকায় পেন্সিল রাখি আমার ভ্রমণ ইচ্ছেডগায় চামড়ামানচিত্রে
অস্পষ্ট লন্ঠন মিছিল মিলিয়ে যেতেই ভাবি উঠে পড়ি চেয়ার ছাড়েনা আমায়

অন্তনির্জন দত্ত- র কবিতা

জাহাঙ্গীর কে লেখা কবিতা

সাঁঝ এলো হাঁটা এলো আরো
কতদূর এই জানতে চাওয়ায় এক সুতলি উট পড়ে থাকে
তার দীর্ঘ গলা শান্ত চোখ আর বানামি বর্ণ গা

চিলে কালান থেকে চিলে কুর্দ, চিলে এ বাচ্চে
এই তো আদর করে নেওয়ার
বুকে পিঠে নরম কাঁখালে
চাপড়ে মেলে দেওয়া শীতের শীতলপাটি

মাজার হে কতদূর পীর, লাইলাক ছুঁয়ে রাস্তামাটি বাজে
মাঙ্কি টুপি ঢাকা মানুষ বাজে কি আরোব্বা লাল হয়ে ডুবে যায় . . .

সন্ধেবেলা টেনে কতকিছু নেয়...রাস্তাবাতি, কতো খণ্ড মাঠ আর কি বিরাট গাছ

ঘাম শক্ত হয়ে যাওয়ার পর তবায়ফ জানে এত বড় গাছ তুলে দিয়ে কিছু মাটি হাঁপিয়ে আছে পীর।

শ্রীদর্শিনী চক্রবর্তী- র কবিতা

বাহারের অংশমাত্র

অন্যরকম কিছু ভাবতে ভাবতে আর একইমত কিছুই থাকেনা। একে অপরের থেকে একটা একটা করে সীট ছেড়ে দিয়ে, অন্ধকার হলঘর আস্তে আস্তে ভরে যায় যাবতীয় 'অন্য'গুলি দিয়ে। এদিকে রাস্তায়ঘাটে নির্বাচনী প্যামফ্লেটে ওড়ে হলুদ- গোলাপী- নীল প্রতিশ্রুতিপূর্ণ লোভবাদ। আমাদের আঙুলজন্ম ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে স্পর্শের ঝিনুক ঠোঁটে করে। অসামান্য কৌতুক নিয়ে ফিরে আসে সামান্য বাহার।

।। ১ ।।
প্রত্যেক টেবিল থেকে ইঁদুর ছোটার শব্দ আসে।
ইঁদুরের পেছনে আমরা,
আমাদের পিছনে ছোটাছুটি
সমস্ত দৌড়ঝাঁপ আটানার হৃদয়ের মত
ফাল্গুন হাওয়ার দেহে বিষন্ন মাদুর পেতে
বসে পড়ে ইতস্ততঃ একা
সখ্যতা হারিয়ে যায় নীলাভ শব্দঘন স্ক্রীনে।

।। ২।।
শীতপাখি ফিরে গেলে বাসন্তী হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ ফায়ারপ্লেস জীবন।
আগুন প্রসন্ন থাকে যতক্ষণ জ্বালানীর প্রশ্রয়।
অতএব হিসেব করলে দেখা যাবে আগুনও কাঙাল,
অথবা পরাশ্রয়ী অতঃপর ইন্ধনজীবি –
কতকটা বিপ্লবের মতন।
দক্ষিণের হাওয়া দিলে ইউক্রেনে চপার ওড়ে—
এদিকে বসন্ত বৌরী ডাকে।

।। ৩ ।।
ছাই থেকে ডেকে ওঠে ফুলেদের জায়মান জীবন।
ইতস্তত, অস্থির থাকে যতক্ষণ না প্রশ্রয় পায়
অন্যকোনো বসন্তশরীরে।

ছাপার শাড়ীর মধ্যে বসবাস আবদ্ধ যার
তার কোনো সুবাস হলো না।

সব্যসাচী হাজরা- র কবিতা

উটবিকার

১।
গ্রহরূপের পৃথিবীতে ৪৩ কিমি বেশি উট উঠে আসে
উটের আবর্তন চোখে পড়ে পাতালিক উট
যেমন শিলার সংজ্ঞায় থর থর উটেরা সব বাবুনের ম্যাগমায়
এক মরু মরুমরু মরুগুলো
শিলা শতরূপা আন্তরিক হয়ে আসে
তারিখরেখার গায়ে আহা! অতএব কোলকাতা
উটের একুশে জুন
উটের বসন্তবিষ উব আঞ্চলিক উট
চোখে পড়ে কোণে কোণে ৪৩ ডিগ্রীর উট ফিরে গেছে দ্রাঘিমায়
আরেকটা উটের খোঁজে
মরু এক এক এক একাকার

২।
ফুকোর পাজামায় নন্টে ফন্টে- র ঊষা গোধূলী
পিনের দাগ পড়ছে না
অধিবর্ষের উট তিন ধরনের বায়ু সরিয়ে আবার ফুকোয়
উটের কান্না মানে মাঝরাতে ফলাফল
ফোঁটা জল জলজল জলাধার

৩।
হলমা ও আর্কের টয়লেটে আমাদের সুলেমান পৃথিবী বরাবর ফুকোয়
৭ মাত্রার চেয়ে শক্তিশালী বুক , তরঙ্গ লাগে বুকে , বিজয়ার শুভেচ্ছা নিও।
কেননা উট সাম্প্রতিক উট বিছানায় বিল্বিল বাজে
উটেরাও বাজে বিভক্তি থেকে বচনে
এক মরু মরুমরু মরুগুলো

৪।
বৌদির বুকের উট প্রমান মাপের , প্রমান সময়ের কীটনাশক , আগাছানাশক , পলিথিন
গাছে গাছে ঘষা লেগে তেজস্ক্রিয়
দাদার উট তেমন নয় , উল্কাপিন্ড , গ্রহপুঞ্জের ধূলিকণা
উটের বায়ূদূষণে শুদ্ধ অশুদ্ধ লেখো
উটের প্রয়োজনে কোলকাতা
তালি হাঁ পালি তা
উট মানে কফিশপ , স্বশাসিত চুম . . .

৫।
উটের শহর তৈরীর কারনঃ
উটের সংসারে মূলমধ্যরেখা নেই। ওদের হেমন্তকাল মুছে গেছে কবে! এখানে
উটবাসা দিনেও খোলা রাতেও খোলা ।

মায়ের আদরে ফুকোয় আদিম জাতি বিশেষ। কুঁজ মানে জলাধার , উট মানে মরুযান , উটেরাই জানে।

৬।
পুংলিঙ্গের র‍্যাডারে বাজছে উটেদের গণগান

শুধু বালি বালিবালি বালিয়াড়ি
একমাসের বৃষ্টি নিয়ে ধীরে চলো উটপাখি উড়ে যাও উটনায়

৭।
ধরা অধরার মাঝে মাসিমা শুনেছো উঠতি কুসুম , ঘষেছো সুমেরু সাবান মেখেছো কুমেরু ক্রীম
কি লাগালে উট বসে না গায়ে
কি ছড়ালে
বেঙ্গল উট বাংলা হয়ে যায়!
প্রশ্নের পাশাপাশি উত্তর রাখা আছে. . .
আমাদের উটনামা গুঞ্জন গানে
উটে এসে চা নিয়ে যা , চায়ের পাশে খাস্তা উট সস্তা বাগি চা
নাদিম তা- না- না- না লুকিয়ে রাখো ছা- না না- না- না না
উটশিশুর চোখে
একাকার এক এক এক মরু

৮।
ওই বাজে , উটের সাম্যগান , ছিন্নমস্তা উটেরা সব
লাইনার রক্তের দোকানে , তাল ঠোকে, অমৃত পড়ে , তাল ঠোকে, ঠক ঠক ঠক
শীতের দোরগোড়ার উট পা চর্চার দরজা খুলে যায়

রকমারি খাবার চেখে দেখুন
উটের রেস্তঁরায় , শীত বস্ত্র সঙ্গে রাখুন. . .

৯।
সময়টা বসন্ত হলেও দূষণেও ত্বকে বসন্ত মুখ বরাবর ফুকোয়
আজ জন্মদিন হলে
শুভ রঙ- উট রং
শুভ দিন- উটবার
মিত্র রাশি- উট অবশ্যই উট
শুভ সংখ্যা- জানা নেই

১০।
বাঁ হাতের বাটিতে বহু হাত ঘুরে হাটখোলায় উট মহাশ্মশানে
প্রতি- জন্মের পাশে কোনো উটবলি নেই
বরাদ্দ নিয়ে কত চোখ নিবু নিবু কত আলো এটা ওটা সেটা
কত বাচ্চা মরীচিকায় উট , শিখে নিলো মরুঝড় , বালিয়াড়ি বালি
বালি শুধু বালি
গলায় উটে এসো পাশে ধ্যানমগ্ন উট
কবিতায় উটরোগ
সহবাসে ধারাজল জ্বলজ্বল জলাধার. . .

অলোক বিশ্বাস- এর দুটি কবিতা

চলো যাই

পানসির কথায় এসে মনে পড়ে কিশোরীদের আলপনা, যারা ঐশ্বরিক বিরোধীপক্ষ
ভেদ করে চলে যায়
রেলিং পেরিয়ে পেরিয়ে অবসর কাটে, কাটে বাগান বাড়িতে ওঠা প্রাসাদসম দিনযাপন
আর কোনো মৃত্যুভয় নেই আমার, পানসিতে উঠে পড়ে মৃত্যুর আর কোনো প্রসঙ্গই নেই
ভুলে যাই সেইসব কথা, বাক্য নয়, মাত্র শব্দময়তা, যেখানে কোথাও কোথাও অন্ধ
অন্ধকারের জন্ম হয়েছিল
কোনোদিন স্রোতহীন জলের ইচ্ছাতে ভিড়ে যেতে পারিনি, তোমারও ব্যাটারি ফুরিয়ে
গেলে খেলার সামগ্রী করোনি মৃত ব্যাটারিকে
ঈশ্বরকে বহু অণু- পরমাণুতে ভেঙে ভেঙে দেখা যায়, নতুন প্রচেষ্টা নয়, যাযাবরেরা
করেছিল, এখনও করে থাকে
সকলেই কুয়াশার ভেতর দিয়ে পানসি নিয়ে যায়, আমিও সাধ্য দেখাই
প্রাচীন প্রদেশের মতো নয়, বিদেশেরও নয়
খই মুড়ি চিঁড়ে এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রি, কিছু অজানা অচেনা র‍্যাপিডিটি অর্জন করে
পভার্টি লাইন ছেড়ে বহুদূর এসেছি
এইসব আয়োজন প্রয়োজন লালবাতিঅলা প্রতীকের নয়, উদ্দেশ্য নয়
বৃহৎ লেক্সিকন আঁকড়ে কল্পনিহারী অভিযানে ভুক্ত হওয়া
সব জল সব হাওয়া সব পাখি ও মায়া নির্জনতারা যেখানে যেখানে যাবে
আমিও সঙ্গে যাবো ভাষাকে বিষয় করে রূপতত্ত্বকে বদল করে

পরিবেশ

কাঠের পাগুলি আমাদের কারো নয়, কাঁটাতারগুলি আমাদের কারো নয়
সন্ত্রাস আমাদের কেউ নয় সন্ত্রাস দারিদ্র সীমারেখা ছুঁয়ে থাকা প্রবাহে পেট্রোল
বোমা নিক্ষিপ্ত করেছে
এসব ছাড়াও আমাদের পরিসরে অন্যান্য এতকিছু বস্তু ও মায়া আছে
শব্দ ও ধাতুর প্রজন্ম থেকে উৎসারিত মণিময় চিত্রকল্প আছে , আমরা যখন
খুশি যেমন খুশি স্বপ্ন দেখলেও বাংলা ভাষা ক্লান্ত হতে পারে না
যে কোনো অকথ্য দূষণধারা
কৃষ্ণ শব্দটির কাছে এসে মাথা নত করে
কৃষ্ণকে অণুপরমাণুতে ভাঙতে ভাঙতে
যে কোনো দুর্বোধ্য প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যায় বাউলেরা
গ্লোবাল ওয়ারমিং এর রাত্রে যেসব সভাপতি ও সম্পাদকের জন্ম হয়েছে
তারা আমাদের কেউ নয় , এরকম বহিঃপ্রকাশটি করার সাথে সাথে আমরা যদি
পৃথিবী উচ্চারণের কারণে অন্তরস্থ প্রতিবাদী বাক্যগুলি জড়ো করি, দেখা যাবে
যাকে হেরে যাওয়া বলে গতানুগতিক আড্ডায় সেই তত্তের প্রতিটি পঙক্তিতে
ব্যাকরণগত ও ভাবগত উভয় দিক দিয়ে অপরিমেয় ভুল থাকলেও

প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিরন্তর পাঠযোগ্য করে তোলা হচ্ছে কিন্তু যা কিছুই
বাধ্যতামূলক ও পরীক্ষাভিত্তিক তারা অনেকেই আমাদের কেউ নয়
মোহরকুঞ্জ প্রেমিক প্রেমিকার মুক্তাঞ্চল হওয়ার পাশাপাশি
ব্যাপক যৌনতাঘন হাওয়ামহল ও বারিপাত হয়ে ওঠার পাশাপাশি
এবং এসব যৌনবিহারকে যদি সংস্কৃতির পরিপূরক স্বচ্ছতা হিসাবে মান্যতা
দেওয়া হয় , মুহ্যমান হয়ে কাদা ঘাটাঘাটির কোনো প্রশ্নই থাকে না আমাদের
চোখ সামান্য ঘোরালেই দেখতে পাই মোহর কুঞ্জের সামগ্রিক পরিসর ও তার
আশপাশ , সার্বিক ও ইতিবাচক করিওগ্রাফির এমন সব ইঙ্গিত প্রবাহিত রেখেছে
যাকে আমরা সর্বনাশা যুদ্ধের বিপক্ষে ব্যবহার করে শান্তিময় বার্তা পৌঁছে দিই
প্রকৃতির সমস্ত উপাদানের ভিতরে
দুর্গন্ধপূর্ণ চেয়ার ও চৌবাচ্চার সঙ্গে আমরা বসবাস করেছি
ঘুম থেকে উঠে দেখেছি ভাগাড়ের পর ভাগাড়
রচিত হয়েছে আমাদের সকল কাণ্ড কারখানাকে লক্ষ্য করে
থুতু ও গু মুতের শহরকে
পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারিনি একেবারে নির্জন লোকালয়ে
তালিকা বানাতে গেলে দেখা যায় অনেক তত্ত্ব ও তন্ত্র আমাদের শিরা উপশিরার
বাইরে থাকার যোগ্যতা অর্জন করেছে
পথে ও পথান্তরে পড়ে আছে অসুরের সঙ্গে বাঁধা বর্জিত বস্তু
যাকিছু বর্জিত বলে ভাবা হয় , তার সবই বর্জিত হওয়ার কথা নয়
পরিসরগুলিতে রঙ চাপিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি আমরা
আমাদের অন্তরসত্ত্বা তাকিয়ে থাকে পরবর্তী প্রজন্ম কোন ভাষায় মিথস্ক্রিয়া করে
তা দেখার জন্য, প্রতিপালন করার জন্য এবং অন্যকিছুর জন্য . . .

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়- এর দুটি কবিতা

হ্যামলেট

শুধু তুমি আর আমি, হোরেশিও
আর কেউ টের পাচ্ছে না মনোবিজ্ঞানের এই দগদগে ভূমিকার প্রথম পাতা
শুধু ছাই উড়িয়ে উড়িয়ে দেখছি, আর মিশে যাচ্ছি ছাইয়ের ধূসরে…
পুরোনো শর্তগুলো পতাকার মতো টাঙিয়েছি উঠোনে বাঁশের খুঁটিতে
আর কঞ্চি বেঁধে জানলায় জানলায় উড়ছে প্রতীক্ষা
যে বার ফিরতে অনেক রাত হলো, আমাদের পোষা কুকুর
শুঁকে নিলো গায়ের অন্ধকার, নিদ্রা ও ক্লান্তি
নশ্বরতার প্রতি অভিমান ক'রে যখন আমরা
সাতদিন উপোসী ছারপোকা হয়ে খিদে বাড়িয়ে নিলাম
স্বপ্ন, প্রার্থনা ও আর্তি বাড়িয়ে নিলাম মহাকাল বরাবর
সিলিং থেকে ঝুলন্ত দড়ির পাশে আঁকতে শিখলাম কোটেশন- চিহ্ন
নিশ্চুপ নিজের কাছে সব শব্দ গচ্ছিত রেখে
মাছ ধরতে বেরোলাম বুদ্ধপূর্ণিমায়
হাঁ- মুখো স্বপ্নের পেটে কতো রাত প্রশ্নহীন কাটালাম –
খোলা না বন্ধ, ভাত না রুটি, মদ না তামাক, জন্ম না মৃত্যু ,
দাহ না শান্তি, ঘুম না বিস্ফোরণ. . .
এ'সবের বাইরে দুটো থামের নির্বোধ আড়ালে
দু'জোড়া আধখোলা অবিশ্বাসী চোখে
শুধু তুমি আর আমি, হোরেশিও

অতীতচারণভূমি বরাবর

এত অন্ধকার আমাদের মধ্যে জড়ো হয়ে থাকে, কাটাতে গেলেই চামড়ায় কেটে বসে,
স্মৃতি নয় ইতিহাস নয় এক তীব্র জ্বালাতন রোমকূপে হাড়ে মজ্জায় ঢুকে পড়ে শিহরণে,
আত্মপ্রত্যয়ে. . .
জানলা কেঁপে ওঠে। মুগ্ধতার চর্চা থেকে দূরে উঠোনের কোণে তাকে নিয়ে যাই, চলো,
যেভাবে সেঁয়াকুল খুঁজতে ছায়াঝোপে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতেন কিশোরবেলার
বিভূতিভূষণ, আর দুপুরের ঘেমো বিছানায় পড়ে থাকতো একটি অস্ফুট প্রণাম. . .

পায়েলী ধর- এর দুটি কবিতা

সব চিত্র কাল্পনিক

পরিচিত দৃশ্যগুলোর বদলে যাওয়ার তাগিদ ছিলো
হয়তো তাই কোনওরকম পূর্বাভাস ছাড়াই ঝড় এলো চতুষ্কোণিক মহল্লায়
ভিনদেশী ক্র্যাফটিং ডাইনিরা মারহাবার তালে পা মিলিয়ে হঠাৎই কিংবদন্তি
হতে চাইলো। সন্ধিবদ্ধ দলমণ্ডল থেকে আলগা হতে হতে একসময় খসে পড়ল
কেউটে কেঁচোর জারিত রসায়ন। স্বভূমার শূন্য গর্ভে চটুল পার্থেনিয়াম মেলে ধরলো
তার বিষ বিষ ডালপালা। পাকদন্ডির পথ হয়ে ফেলোপিঙ্ক গহ্বর অব্দি নিমেষে
ছড়িয়ে পড়লো অবিশ্বাসের পিচ্ছিল প্রদহন। পরিবর্তিত পট ও ভূমিকারা এখন
সিদ্ধ হাতে লিখতে জানে ব্যবধানের সংবিধান। এতদিনের জমিন জিরেত তার
সমস্ত অ্যানাটমিতে লেপে নেয় রঙবদলের রূপটান। আর ছত্রিশ গুণের ভুলে ভরা
জোটক পৃথিবীর পথ আটকে দাবী জানায় - ফিরিয়ে দাও ভরসাযোগ্য বিশল্যকরণ।

শুভমঙ্গলম

যথেচ্ছ রঙরসিয়ার মৌতাত পেরোনোর পর কর্কটবৃত্তের দিকে হেঁটে চলে
ছাপ্পান ছোরির চোলি ঘাগরা। ফুল্ল কুসুম মুকুলিত হলে সাউন্ড অ্যাকশনিক ক্যামেরায়
ঝলসে ওঠে ইন্দ্রপুরীর সাজানো স্বয়ম্বর। কলের তোতা তুতি গুড্ডা গুড়িয়া দুলে দুলে
শিখে নেয় বিন্যাসহীন বাকবকানি। সমস্ত এয়োস্ত্রীক স্মৃতিচিহ্ন বন্ধক রেখে মার্সিডিয়াল
চাকায় ঘুরতে থাকে সপ্তপদীর বিধিনিয়ম। যদস্তুর মাঙ্গলিক মেহফিল তদস্তুর শনি বাসরে
রাত জাগে কালী সাপের শুক্রকীট। গাঁটছড়ার লজ্জাবস্ত্র সিপিং গেলাসে ঠোঁট চুবিয়ে ফ্লোরাল
কেবিনে ছড়িয়ে দেয় ছিদ্রহীন কপার টি। অন্ধকার জতুগৃহে এক এক করে পুড়ে যায়
পানপাতা - কুনকো সিন্দুর - লাইনিং মাসকারা - কড়িচেলি - খইদর্পণ - হিপ্নোটিক ব্লুআইজ।
প্রজাপতির উড়ানপর্ব থেমে গেলে নথ ভাঙা বাসী মুখ রাজপথে খুঁজে চলে দীর্ঘস্থায়ী স্পটলাইট
কিম্বা দুআনার জীবন।

ভাস্বতী গোস্বামী- র চারটি কবিতা

জিরাফ ৬

সকাল সকাল জল
এত অসুখ তবু বৃষ্টির পায়চারি
উল্টো সিগন্যাল
বাজার মাগী মল্ হ'ল
কিছু শৈশব ভাসে
হাত পা কামড়াচ্ছি
কোথায় একটা সময় ছিল
বাস থেকে নেমে পড়লাম
সুনামি ঘিরে ফেলছে
মাথার জিরাফটা এখন স্টোরি
প্রতি শ্বাসে রেপ শুনছে বা হচ্ছে

জিরাফ ৭

রুমালের কোণা তুলতেই তাঁবু

পাহাড় ঠেলছে ঝর্ণা
তাঁবুর ভিতর ক্রমশ
রুটি আঁকছে জিরাফের বাবা মা
চ্যাপ্টা বা গোল তুলি রাতদিনের গান্ধী যোজনা
তবু কমিশন বসল
বৃষ্টিচেষ্টা কত যে ভাসল
জিরাফের ভাই বোন ভাসতে ভাসতে চিঁড়ে তোলে আর দুধ খায়
দুধ ভরে ওঠে গমের ইজের
এবার টেপাটুপি
এবার চেক্ নাই
গমক্ষেতে যুগলবন্দী জিরাফ

জিরাফ ৮

ভিকি ভিজছে
অস্থির চা'য়ে গল্প নেই
রক্তে বা চিনিতে ভেজা নেই
ছাপ ছিল
কাঁটার তাবৎ নুনহীন
ডিনারে কম্যাণ্ডো
মুখ্যমন্ত্রী দুলছেন দেখে ক্যামেরাও হেসেছিল
নাদির ঠেলে ঠেলে কেন্দ্রবিন্দু
চেন হতে পারত
শনি মঙ্গলে চৌকাঠকথা
মাংস রুটি সংলগ্ন

আর
জিরাফে চোদ্দ আনা ঘুম

জিরাফ ৯

চোখ খুললেই হাসি মেলা ক্যামলিন
রোদ আর বৃষ্টিকে এক পাল্লায় ধরবো কি করে
ভাবতেই মিতুন এক সোনার কেল্লা
লাল হলুদ কিত্ কিতের পায়রা নামে
গলার জিরাফে পোষ
আদুরী ক্যাম
ধুপধাপ বারান্দা বাথরুম সর্বত্র পড়ছে
জিরাফ ও নেতা এখন সমান ফুটেজ

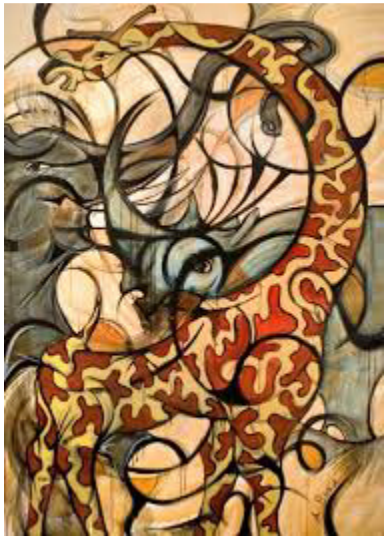

গৌরব চক্রবর্তী- র কবিতা

স্মৃতিটোরিয়াম

১.

স্মৃতিও পাগল হয় খামে
পুরাতন চিঠির ওপর দিয়ে হাঁটি
কারফিউ নেমে আসে ঘুমের ভেতর
হয়ত নখ থেকে পিছলে যাবে আঁচড়ের লালা
শরীরের ঝুরঝুরে ধোঁয়া, গুঁড়োমেঘ

২.

গতিসূত্রে দূরত্ব বাড়াচ্ছে পোতাশ্রয়
সূর্যাস্তের নিজস্ব ভূখন্ডে চেনা ঘাম
কামড় বসাচ্ছে
দৈববাণীগুলো পুড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়
একা আমি, স্মৃতির ভেতর জেগে আছি

৩.

আক্রমণ থেমে যায় ছবির দেয়ালে
দোলনার শরীরে দাম্পত্য উদাসীন
আঙুলের প্রশ্নচিহ্ন অগোছালো থাকে
বারান্দার তারে
এখানে নাইটল্যাম্প - - স্মৃতি থেকে আলো মেখে খায়

৪.

রোগা হয় পুরাণের নৌকো
কুপি- জ্বেলে লিখে রাখা ঘুম ফিরে আসে
প্রেমিকার গায়ে
যেখানে সারি সারি পেন্সিল চোখ মোছে জামার কলারে
চোখের দু'পাশে আঁকা ব্রিজ
ব্রিজের দু'ধারে
আমি আর স্মৃতি মুখোমুখি বসি

৫.

সামান্য বাদাম থেকে খোসা খুলে রাখি
খোসাগুলো থেকে দূরে সে কান্না ছাড়ায় জমির ওপর
শব্দের বৃত্তে ঢুকে পড়ে খসখস, আঁশটে গন্ধ
ক্রমশ ঠান্ডা হয় শব্দের সাইকেল
চোখের মেঘ থেকে ঝরে বৃষ্টির প্রেম
আহা প্রেম! স্মৃতির শরীরে এসে নামে

৬.

আর বরফ! আইসক্রিম মনে পড়ে - -
শ্রাবণ জমিয়ে রাখা স্মৃতির ভেতর
ডেন্টিস্ট থেকে... বড়জোর মনখারাপ
দাঁতের গোপন এনামেল
বরফের জমি থেকে মাথা নাড়ে গুহাবাসী নদী
প্রাচীন ফ্লেভার রাখে ত্বকে
স্মৃতিরা জমে গিয়ে আইসক্রিম হয়. . .

৭.

ধরো, আমি আর স্মৃতি - - পাশাপাশি স্যানাটোরিয়াম
অবৈধ বল্কল এসে ঝাঁপ দেয় মুখে
মুঠোতে ঢুকে পড়ে বাতাস, আত্মসুখ
চোখের পাতার দিকে স্মৃতির শাবক,
লুকিয়ে রাখা শহর, কাটাকুটি খেলা
অত:পর, কাগজের ওপিঠেই ভ্রম
খয়াটে ফানুস
ভুল... এখানে স্মৃতিরা সব

৮.

স্মৃতির ভেতর থেকে ফিলামেন্ট
পাশ ফিরছে, উঁকি দিচ্ছে আঙুলে
স্মৃতির দেরাজ থেকে আলো - -
নিরামিষ... বিলি কাটে নূপুরের গায়ে
নূপুরে দুষণ বেজে ওঠে, গান হয়
সেই গানে - - তুমি আর আমি
মনে মনে নাচি. . .

৯.

ইন্দ্রিয় ক্রমশ ভুতুড়ে, ঈশ্বরহীন
সন্ধ্যার দেহযান পেরিয়ে জলের আওয়াজ হয়
হাঁটাপথ ভিজে থাকে... আলো
স্মৃতির প্ল্যাকার্ড চুঁয়ে নামে
বারান্দায় খসে যায় রিংটোন
শেষরাতে উধাও হয় বিষুবরেখা
স্মৃতির বয়সফলকে ক্রমশ আমরা... প্রাচীন হয়ে পড়ি

১০.

স্মৃতি দিয়ে আঁকা অভিশাপ, শাপগ্রস্ত রেখা
আলপনা হাওয়ার শরীরে
ঝাঁপির খোলস কিছুটা সন্ধে- রঙের
রূপক উড়ছে কোজাগরীর চাতালে
সম্পর্কের ভগ্নাংশে ইন্টার্নেট ছুঁড়ছে - - রেস্তোরাঁ
এবং মুখোশ
আমরা ঢুকে পড়ছি
একে অপরের নামের ভেতর. . .

উমাপদ কর - এর দুটি কবিতা

কবিতা পারানি- - ১৯

লব- এ বাস, হর- এর খবর রাখতেই হয়

ঘরে উঁকি, জাসুসি, মায় সেঁধানো
হরও কি একই ধারা?
দুজন যদিও একপাতে খাইনি
এক গ্লাসে সোম
রস- এ মাতিনি
আরও যা যা সব করিনি করিনি . . . . . ।
ওপরে থাকতে থাকতে নীচে যেতেও শখ হয়
পারিনা
ওকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখেছি, উন- ই থেকে যায়
আমার নাম পরিচয় ঠিক রেখে
আমার ওপর তলার ঘর থেকে নীচে পৌঁছুনো হয় না
ওর নাড়ি জানি, নক্ষত্র জানি
একটা সম্পর্ককে আজীবন আগলে রাখি
কিন্তু এক বিছানায় নৈব নৈব চঃ. . . . . .
আমি ফুল হয়ে দেখি, সেও কখন ফুল হয়ে হাসে
গান হলে সেও গান হয়ে যায়
'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে' র মধ্যে শুধুই এক উপসাগরীয় রেখা
যাকে ডিঙোনো গেল না শত সাঁতারেও. . . . . .

কবিতা পারানি- - ২০

হর হর বোম বোম. . .
নীচে আর থাকব না, দ্রোহ. . . ।
বাঁধ দিয়েছ?
উড়িয়ে দেব ভাসিয়ে দেব
সীতার পাতাল- প্রবেশ আমার ভেতর দিয়ে
আমার ভেতর দিয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল
মূলে থাকি আমূল
লবকে চিনি জানি ভালোও বাসি
সে আমায় কতটুকু খোঁজ না রেখে. . .
মাইরি বলছি, হর, হরণ না করেই
আর নীচে থাকব না, কথার কথা
দ্রোহ ফ্রোহ কিছু না
কি যেন অজান্তেই নিজেকে বিপ্রলব্ধা ভেবে বসি

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলছেন, ওই লিঙ্গ সম্বন্ধীয় চেতনা
আর জানি লব ছাড়া এমন আর কেউ ভাবে না. . . ।
লব সবসময় > মি, আমি সবসময় < লব।
মেনে নিই তর্ক না করেই
আমাকে বাড়িয়ে কমিয়ে নিরীক্ষার কাচে ফেলে
যতই দেখা হোক না
কখন যে লব- কেই জড়িয়ে থাকি. . .
ভালোবাসা? সে লব- কেই না হয় জিজ্ঞাসা করুন. . . . . .

দিলীপ ফৌজদার- এর তিনটি কবিতা

গাহন

শুদ্ধরূপ আসে আসে হয় এসে ফিরে চলে যায় বারবার
খুঁজতে খুঁজতেও কিছু কথা গড়ে ভাবনা আসে
কলুষকে কলুষ দেখা – খুঁজে বের করা ও দেখিয়ে যাওয়া
এসব পেরোলে

ভয় ও সন্দেহ যেটা মনে ঢুকে গেল তার কাজ শুধু কুরে কুরে খাওয়া
বৈশালীর গণতন্ত্রে স্নানের আনুষ্ঠানিক প্রথা একটা ছিল
সেইসকল স্নানে ধুয়ে যেত সব পূর্বাপর
শুরুয়াত হোত সেটা ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন এক বর্তমান
গাহনের নিষ্কলুষ জলে ও অতলে
গতকে বিদায় দিয়ে আগতকে আসতে দিয়ে
এমনিই গাহন ভাবনা - পরিপূর্ণতায় প্রথা । আস্থা নিয়ে প্রতিষ্ঠান থাম ।
কেউ সুখি নই তবু সুখ আছে এরকম ভাবনায়
সুখকে দেখতে পায় দূর দীর্ঘায় বসে থাকা
প্রসন্ন মানুষ
ভাল মন্দ দুটোকেই পাশাপাশি থাকতে দিলে
ভয়ংকর বিভ্রমের জায়গাটাতে সামিয়ানা বাড়িয়ে বাড়িয়ে
স্পষ্ট আমন্ত্রণ পেতে দিলে
লোক জড়ো, যানজট, অবরোধ এইসব দৃশ্যের অজান্তে
আপনাআপনিই গড়ে ওঠে এক অলৌকিক কাট আউট
জড়ো হওয়া মাথাদেরই স্বপ্ন থেকে
স্বপ্ন হাতে চলে এলে হাতবদল হয় সিংহাসন হয় -
মাংসপেশী দাঁতাল হিংস্রতা আশেপাশে কিম্বা ভেতরেই
দেওয়ান- ই- খাসের থেকে, দেওয়ান- ই- আম এরও থেকে দেওয়ানিকে
মাঠে বা ফুটপাথে টেনে নামানও যেতে পারে
ও দিয়ে কতটুকুই বা আর বেড়ে উঠবে টি- আর- পি অথবা জনমত
কোন স্বচ্ছ সরোবর নেই
তার কোন পোক্ত আল্‌ও নেই যে
মানুষ দাঁড়াবে
এসব প্রথার কোনখানে গাহনের কোন কথা নেই

জেদি ও অপরিবর্তনীয়

এই সব জাগতিক শব্দগুলোর
এক একটা চেহারা থাকে । শব্দকে বিকৃত
করলে চেহারারা দূরে দূরে সরে যায়
কোন চেহারাই তার শব্দের বাইরে কখনই
যেতে চায়না ।
চেহারা বিকৃত হয় সময়ের পিটুনিতে
ক্ষয়ে যায় ক্রমাগত না দেখতে থাকায়
মিলিয়েও যায় কিন্তু ঐ চেহারাই থাকে
যা বদলায় না কোনদিনই ।
শব্দরা বিকৃত হতে হতে
অন্য শব্দ হয়ে যায় অন্য চেহারার
সে চেহারা আবার প্রসেনিয়মে
দৌড়ে খেলে শব্দের ওপরে ঘর পাতে
তার ওপরে অলংকরণ হয়
অভ্যাসবশত
তার ওপরে অভ্যাস স্থাপিত হয়

মূর্তি গড়ে দাপুটে ভাস্কর

মূর্তি গড়ে নীরব ডুবুরি পটুয়ারা ।

সুদর্শন

মেঘের ভেতর ঢুকে থাকলে তাও মনে হয় যে কোথাও কিছু আছে
ঐ চা টেবিলের ছাত আর কোনার টেবিল আর আমরা তিনজন
মেঘের নি:শব্দ চলে আসাতেও খুরের আওয়াজ ভাসমান, সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়
আবহাওয়াদপ্তর কিছু দেগে দেয়নি এখানের নিশ্চিন্ত চায়ের কাপে
ধোঁয়ার অবিচলিত সৃজন ও উবে যাওয়া অনর্গল
পর্দার সংবাদ বিনোদনে কাল কাটে অলস আদুরে শীত ছোঁয়া লাগা
দৈনন্দিনকার রোদ ঘাম ও বৃষ্টির আর্দ্র মাখামাখি থেকে অবিশ্বাস্য দূরে
দূরদর্শনের ভয়াল সতর্কবার্তা এই মেঘেদেরই চক্রান্তের
বিরল আকাশজটলা কি ভাবে কি ভাবে যেন ঘটে যাচ্ছে
সুদর্শনচক্র ঘুরছে, এগোচ্ছেও আজ কিংবা কাল এসে আছড়াবে নিরীহ কোন তটে
তবুও কি হয় যে একটা প্রবল তাগিদ যেন এক্ষুনি বজরা নিয়ে

নেমে পড়ব বঙ্গোপসাগরে
তুষার কিরীট আঁকা পাহাড়ের বরাভয়ে সতর্ক থাকার কথা অবান্তর
তবু ঐ কণা কণা সুখি সুখি বাস্পজাল জড়ো হলে কিছু কি বাধাবে ?
কখনো কি শুরু করবে দুর্দান্ত খেলার খেল ?
কাল সকালে রওনা হবো উড্রতটে বঙ্গোপসাগর

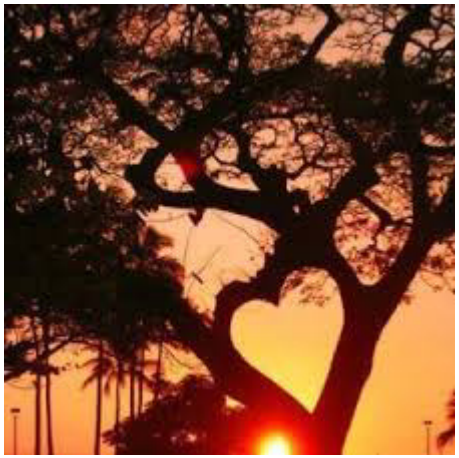

রঞ্জন মৈত্র- র দুটি কবিতা

লগ ইন

তারা তো আসবেই
যখন অমাঝোরা
মীড় মাকরানা
দেরি করলাম বাজনায়
দেহরি করলাম অন শোন
বেঞ্চিটাই পড়ে রইল

দুটো মুখ পাল তুলে কোথায় কোথায়
দুশরীর বেঞ্চিটাই ধ্বনি করে
কোথায় কোথায়

বানানের পাশে এক ভোর উঠল
বিভোর সূর্যটির কথা কই
অরক্তের পাশে এক কট্টর তূলি
জিন্দাবাদ মুর্দাবাদ
বাদ দিতে দিতে মোরাম পৃষ্ঠাটি
নক্কার নক্কার
কাঠের প্রচ্ছদ খুলে যায়
প্রচ্ছদের রুয়াম রুআফজা
তারা তো আসবেই

পেন ড্রাইভ

(উৎসর্গ ঃ স্বদেশ সেন)

দেখা যাকে বলে সেই এক সিমসিম
সোনাকে শোনানো ভাতি
রত্ন রত্নার টপ ও লেগিংস
আলটপকা হাম্পে উড়ন্ত পালসার
সীসম সীসম শব্দে ঠোঁট ঘষাঘষি
আলো আসে থেকে আলো যায়
মৃদু হাওয়ায় ভাসে কাচ ও ফিলামেন্ট
তার ও আখতার

গমঘোর মাঠের পাশে যে যাওয়া
খুব জোরে সেই এক খোলামুখ
আসছি কথার মধ্যে দু' দশ প্ল্যাটফরম ফুটিয়ে তুলেছো
দন্ত্য ন- এর গায়ে রত রতা দুএকটা জংশন
চাঅলাকে সমোসাকে আমাদের স্বপনকে ডেকে বলা
একটা রাউরকেলা ফুটে উঠছে ধীরে আলোগোছে

ঋষি সৌরক- এর চারটি কবিতা

রকস্টারের প্রেমিকা- ১৬

তোর কোলে মাথা রাখলেই মরবিড
ইতিহাসের পাতা খুলে যায়
গৃহযুদ্ধ অথবা প্রেম
আদতে জিদ্দি জয়ের বিকল্পমুখ
অসম্ভব স্বপ্নতোরণ উন্মোচিত হয়
চৌকাঠে দ্বিখণ্ডিত আকাশ মাড়িয়ে
অভিযোজনের বকলেস
প্রকট হয়ে ওঠে
অন্ধ চোখে কে বেঁধে দিলো দর্শনের খেউড়
কাপড়বহুল সুগন্ধ ছুঁয়ে আছি
এলোপাথাড়ি মারছি হাত মাংসল বাটন এ
আবহের ভিড় হারিয়েছে স্বর্গের পাসওয়ার্ড
তোর কোলে মাথা রাখলেই
ঠাঁটিয়ে ওঠে নস্টালজিয়া
এক ছোঁ এ টিস্যু মোছে বাস্তব
আর ফুলেদের মাঝে ডুবে যায়

কা কস্য পরম অণু সন্ধান

রকস্টারের প্রেমিকা- ১৭

আনত ক্যানভাস আর বিকেলের সেতু
অস্বস্তির আঠালো পাঁকে পেঁচিয়ে যাচ্ছে চিতকৃত বেঁচে থাকা
এখানে শৈল্পিক দ্যোতনা এতখানি ধারালো
অজ্ঞাত শিরা কাটে বাঁধনের
এ বাঁধন কোনো উদ্বোধনী ভেবে
ভাঙ্গনের মোড়ক খুলে দাও
এমন শ্রী ঠোঁটে কিনিপুণ ঠোকরাও গোলোযোগ
প্রাসঙ্গিকতার ধুন ছলকে ছলকে বাজে
আমারই বাঁধানো পটে ঝুলে আছো অতিকায়
বহুমুখী রঙের হাঁ
রিনিঝিনি তেড়ে আসে অচিন তুলির শীতলতা

রকস্টারের প্রেমিকা- ১৮

কাঠব পুতুলগুলি বাতাস থেকে ভার শুষে নেয়
প্রতিহিংসার দূষিত পারদ কামড়ে ধরেছে হাইপারক্লিপ
সামাজিকতায় নীরব প্রশ্রয় মিলিয়ে রাখো
একাকীত্বের গালিচায় পা -
রাক্ষসপ্রমাণ দূরত্ব
পাতাখসার মত ছেয়ে আছো রক্তে
মনোটোন
জ্বরমাখা আলোকপুঞ্জ ছাড়িয়ে নেয় খোসা
চুপঘুম এ লীন লোডশেডিং
শহরের সব তার কেটে যাক

রকস্টারের প্রেমিকা- ১৯

পাঁজরে কে যেন বেজিয়ে দিয়েছে জিংগল
চলতে- ফিরতে গুলিয়ে উঠছে সময়
সহ্যক্ষমতার জান্তব ওয়াট – মার্ মোচড়
অহরহ প্রতিটি স্পন্দন ট্র্যাক হচ্ছে
মাইক্রোস্কোপে ফেলা হয়েছে মিশন অরি
ঠাণ্ডা মাথায় খুঁটিয়ে চাঁছা দুর্বলতা
তিল তিল
চারোতরফ পচা জরায়ুর গন্ধ
হাল্কা বাঁচার আরোগ্য খুঁজছি কোণায় কোণায় -
তীব্র থেকে তীব্রতর পচন
ছুটে আসে – গিলে নেয় – উগরে দেয়
এই হতভম্ব বেঁচে থাকার অনিচ্ছে
অথবা পাতি মৃত্যুর হাঁড়িকাঠ
পিষে যাচ্ছে প্রসংগ পিষে যাচ্ছে ছয়লাপ
ছাতুর ছন্দে পিসড্ অফ নশিলা অস্তিত্বের পাউডার
চিল জাগ্রত ইয়ারপ্লাগ হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করছে
আর যাইহোক, ওরা শ্রবণ- অক্ষম মোটেই না

অভিজিৎ মিত্র- র কবিতা

এনজেপি, বসন্তে

১.
ভাবো, সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দু'ঘন্টা লেট করল
আমি আর আমার উল্টোদিকে
আপার বার্থের যুবতী কম্বলে আঁটোসাঁটো
বসন্ত এসেও আসেনি
ফোনে মিহি ক্রিং ক্রিং

শুনেছি স্টেশন ছাড়িয়ে
লাল সবুজ হলুদ খয়েরি
মহানন্দা ব্রীজ
সবাই ডেকে ওঠে

স্টেশন থেকে ঘনঘন ফোনের মিহি
আমি চুপচাপ দেখছি
পয়লা মার্চ
কে আগে এনজেপিতে আড়মোড়া ভাঙবে

ট্রেন না যুবতী

২.

রান্নাঘরে মার্চ শুরুর কাঞ্চনজঙ্ঘা
দু'একটা হিলকাটা রোড
সুকনা ছাড়িয়ে রংটং
হাঁটিপা বাচ্চা রেললাইন
কুয়াশা ভর্তি মোজাপা
স্টিম মাখিয়ে ধোবে বলে
বিনুনী খুলছে

পাহাড়িয়া জলে নিচে নেমে যেতে যেতে
দেশলাই বাক্সরা
আরো ছোট হবার মুখে

জানলা খুললে এসব ছবি
আয়নার মত
একদম কাছে
বিন্দু বিন্দু জমে
অঙ্কুরের রান্নাঘর
ফুটে ওঠার মুখে
প্রথম আলোয়
কাঞ্চনের গাল
চুমু ছাড়াই
লালিয়া মাখছে

৩.
সবুজ ব্লাউজে কাঞ্চন শুয়ে
আমি স্তন গুনেও শেষ করতে পারছিনা

মাঝে মাঝে মেঘের ওড়না
পাখি হবার মুখে

গালের ওপর চায়ের কুঁড়ি ফুটে উঠছে
বুকের মাঝামাঝি রাস্তা
একটু পরে আমি গড়াতে শুরু করব
জিপের চাকায় কাঞ্চন তিস্তা
সবার গান লেগে থাকবে

আমি আজ পয়লা মার্চ
আমি আজ পাহাড়ি কবিতা দিবস
কাঞ্চন কে নিয়ে মাখামাখি
কেউ থাকুক না থাকুক
এনজেপির হুইসল অব্ধি
বুকভর্তি সবুজ মাখিয়ে যাব

বিজয়াদিত্য চক্রবর্তী- র কবিতা

যখন

যখন ফিনিক দিয়ে বের হও
যখন ধুকরে ছেঁড়ো নতুনসবুজ পাতাকুঁড়ি
যখন ঝাপসা ও জায়মান আবেগের শরণার্থী
তাঁবুকে কেটে ফুটো করো গর্ভবতী ইঁদুরের
দাঁতে
যখন পিছলে পড়ো জঞ্জালের ধাবমান গাড়ি
থেকে রাজপথে, কার যেন - - - - কবেকার - -
নিমন্ত্রণপত্র ছেঁড়া ছেঁড়া - - আসবে তো,
এসেছিলে নাকি, ঝাঁঝময় আমোদ- মোক্ষণ
ছিল, ভুরিভোজ, মল্লে- রত ঠাট্টাপরিস্থিতি

যখন পায়ের ঘাতে ছিটকে পড়ে পাশবালিশ
অথবা মধ্যরাত, অযথা যাপনযুক্তি,
চর্বণের তাৎক্ষণিকতা - - এবং হোমগার্ড সেজে
দেখা দাও গলিমোড়ে যেখানে- যা - নেই
তাকে প্রতিশ্রুত কথাদেহ দিতে আর মীমাংসা
করে নিতে সমাপতনের পরিমিতি
যখন, হে ছলনাসহন ঘট, দুলে দুলে ভেসে . . . ,
না- বন্যা না- জোয়ার মধ্যগাঙে, যাও,
ছায়াছুরিকার মতো তটরেখা গিঁথে থাকে
অবরুদ্ধ শ্বাসের শীতলে আর চুল্লির
ধাতব লালে লাফিং ক্লাবে কেঁপে ওঠে
হাহা- হাহা মান্য সহজ নিয়মিত, আড়ানার

আলাপ থেকে ঝরে- যাওয়া পরিযায়ী
স্বীকারোক্তিসহ
আমার গুলিয়ে যায় কেমন- কেমন
কী যেন বলব- বলব ভেবে- ভেবে ভেবে
চুপ করে যাই

তানিয়া চক্রবর্তী- র তিনটি কবিতা

রিজেনারেশন

যে ছেলেটি একটা একটা করে
সাতটা রঙের গোলাপ দিল
বাইকের মাথায় রাখল গর্ভবতী অ্যাসিডবাল্ব
তার অন্ত্রের ব্রাশ বর্ডার ধরে

পিছলে যাচ্ছে চলতে শেখা কোষ
তাই রোবোটিক্স নিজস্ব সূত্রে বলীয়ান
ঠিক প্রাণিজ কয়লা
আর পেশাদারী রক্তের অনাক্রমতা
কেউ কেউ প্রদর্শন করে ফেলেছি
আর পার্শবর্তী মোজায় লুকোচ্ছি
বাসি রাতের অপ্রিয় সত্যি
যে ছেলেটি গোলাপ আর অ্যাসিডবাল্ব সমার্থক
এখন তাকে সাজিয়ে দিই ধর্মগ্রন্থ
গলা থেকে খসে যায় টিকটিকির লেজ
পরবর্তী লেজ - - - কাকতালীয় রিজেনারেশন

আদেখলা

মাইক্রোস্কোপিক সময় - - - বস্তাপচা মানদণ্ড
চুমুতে অরীয় প্রতিসম নারী
ঘুমের বাইরে আটপৌরে টেবিলল্যাম্পের
আলোয় শোথ শোকাচ্ছে ফুসফুস
যে যা পেয়েছে তার বাইরে

আদেখলা ক্লিমেনশনে পা ফাঁক করে ভ্যাঙাচ্ছে
এখন মাতৃভাষায় হিসেব
খুচরো পয়সায় প্রতিসরাঙ্ক
আর দিনের ঠিক অবোধ সময়ে
একগুচ্ছ স্টোমাটা হাঁ করে সূর্যকে বলে ভালবাস
সূর্য চাবুক দিয়ে ভালবাসে
আর বোকা মেয়ে ধর্ষকের পিঠে চড়ে
খোজা কে খুঁজতে বাড়ায়
স্থিতিস্থাপক ভুল - - - মাইক্রোস্কোপিক সময়
তরতর করে বাড়ে বস্তাপচা মানদণ্ড

বিনিময়

ঠিক যেখানে গেলে টিক টিক
একটা ঠিক –এ এসে ঝিমোয়
ব্লাডার টিপতে টিপতে ইতিস্থাপকরা
স্থিতি নিয়ে ভাবে কাল ছায়াপথে যাবে
তারা ইদানিং বিশুদ্ধ নকল ঘোড়ার লুকোনো সৈন্য

বরফ ছিল বলে সভ্যতা চুমু পায় নি
অথচ গলছে বলে পৃথিবীর বাইরে মিলন
টিকটিক - - - সময়ের ধরিত্রীপুত্র
এরোসল হয়ে ঘনীভূত
নারায়ণ শিলা না ছোঁয়া নারী
প্রায়ামের দ্বিএকক হেক্টরে কাঁদে অঝোর
রক্তেই এরোটিক এরোসল
মেঘ নয় - - - দূষিত চারণ
প্রাক্তন প্রেমে শুধু বিনিময় বিভঙ্গ

ইন্দ্রনীল ঘোষ- এর কবিতা

বিশেষ্য

বেঁচে- আছি থেকে
সামান্য জল পড়ে, মানুষের
ট্রেন যাওয়া বাড়তে বাড়তে, বৃষ্টি নেমে যায়
সাইরেনে, মুহূর্তের আগুন জ্বালছে

পৃথিবীর শব্দ- পরিবার
সিনেমাটা শুরু হলো এখানে
ওই যেই, স্টেশনের অপেক্ষা, পতাকায়
একটা ছায়া পড়লো
একটা রাত ঠাণ্ডা সেঁকছে
আর বিশেষ্য জমছে ক্যামেরায়
পলাশ, হারুন, তুষার, কমলা. . .
পৃথিবীর বিশেষ্যগুলো ট্রেনে ক'রে আসে
সিনেমায় ট্রেন চলে বৃষ্টি বরাবর. . .

উল্কা- র দুটি কবিতা

ওয়ান অ্যান্ড অল্

ময়ূরসময়ের একবাক্স ঈশ্বর
পানপাত্র থেকে খাটে উঠে আসে।
বাদবাকি স্থান ও কাল
সল্প সিক্ত আচমন শোষক
পেশায় দোলনচাঁপা. . .
চরণামৃতে নীল মান্দাস
বালিশহীন, তুলো না!
ঈশ্বর ও অপ্সরার বিস্ময়
চারচোখ
কবে কার বন্ধ্যা জন্ম-
এক দিনলিপি পাঁচালি পোড়ার
ধুনো গন্ধে

ম

ম

ম

ওম্।

কপ্পুর

অস্তিত্ব যাপন জাল না
অস্তিত্ব যাপন জানলা

কিছু মিথ্যুক কাগজবল ডাস্টবিনে
ঝাঁপ দিতে উপচে গেল

অর্ধপুরুস্বর

যার ল্যাম্প পোস্টে কোন
নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন নেই. . .

রবীন্দ্র গুহ- র দুটি কবিতা

আত্মহত্যার উতসব

আত্মহত্যার আগে 'চিয়ার্স ও ম্যান' বলে যুবক শূন্যে গ্লাস নাচালো
কেন্নোর মতো শরীরের ভাঁজ ভাঙ্গল, 'হুঁ হাঁ' করল
উলঙ্গ মেয়েরা নিম্নাঙ্গে ওষ্ঠ ছোঁয়াল, থিতু হল - -
ধৃতরাষ্ট্রের পা ফসকে গেল
'রিওয়াইন্ড রিওয়াইন্ড' বলে মাচাং থেকে উড়ে গেল এক ঝাঁক
ডানাকাটা পাখি। বৃত্তঘিরে যৌথমরণ হিম চুপ গর্ভবতীর –
পাসওয়ার্ড খুঁজে পাওয়া গেল না
নিতম্বের শুধু ভগ্নাংশ দেখা গেল
নাভিতল মাপতে মাপতে বৃদ্ধের সময় চলে গেল
মেট্রো ট্রেনে আধ ঘন্টা ভ্রমণ হল - - যুধিষ্ঠির ঝেড়ে ফেল্ল স্মৃতিজ্বর

স্নায়ুর জঞ্জাল
প্রাত্যহিক ৩৬০ ডিগ্রী গন্ধউত্তাপ
মরুভূমিতে খুব ফসল হল সেবার। খোলা স্বতঃস্ফুর্ত শরীরে শূন্যতা
সুখরালির মেয়েরা বল্ল : উস্ শালু, গল্পটা মোটেই আত্মহত্যার গল্প নয়
রাতদিন লড়ছি, আমরা জানি না আত্মহত্যা কি ?

গুপ্তহাত

কপাল থেকে মুছে ফেল্লাম দাপিত মৃত্যুর দাগ। তন্ত্রবিলাসিনী,
দুর্বাঘাসে ছড়ানো শিউলি, আমাকে ফিরিয়ে দাও ভাষাশ্রেষ্ঠ আহ্লাদ - -
অগোছালো অন্ধকারে বিবস্ত্র লজ্জাছন্দ
ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারিনা বুকের বর্ণমালায় এত কেন বিষ ?
রসিকা রমনী প্রণয়ে আত্মঘাতী - কঁকায় গুপ্তহাত
এসো ম্লান, নাভি থেকে উদ্ধার করো নৈঃশব্দের ছায়া
মাঝরাতে উলঙ্গ পিঠ হিম - - দারুণ বেদনায় হু হু কাঁদলাম
অতীত বলতে আমার হাতে একগুচ্ছ নীলরিবন
শেষকৃত্যের আগেই লবনস্বাদ সহবাসের সুখ উড়ে যায়
খত্ আয়া হ্যায় ইয়্যু চক্ষে লাজুক রসিকতা, স্মৃতি নিয়ে খেলা
থিরথিরায় কাঁধের জরুল, ঝুপঝাপ গড়ায় শব্দজেব্রা, ইচ্ছা হয়
টুঁ- মেরে আসি জিরো শূন্যতায়
লজ্জাবাস সরে যেতেই চচ্চরে দুষ্ট রোদ্দুর
ছোবলায় স্তনমণ্ডলীর শোভা,
লাফিং বুড্ডা নাচে। নাচে রোড- শোতে - - বুকের চৌষট্টি খোপে, আর তক্ষুনি
আচান্নক্ খুঁজে পাই হারিয়ে যাওয়া গুপ্তহাত।

কৃষ্ণা মিশ্রভট্টাচার্য- র কবিতা

অন্ বোর্ড

শূন্য দেরাজের অন্ধকার খাবলা খাবলা মধ্যরাত
টুক লাফে আই. এ. এক. শূন্য. এক. আকাশে এখন।
অপসৃয়মান নগর- অট্টালিকা- সবুজবুনোট
কার্পেট- ইয়েলো লাইন
বাতিস্তম্ভ
মধুগন্ধী ইত্বর নীল আলোয় যামিনী যাপন
আপেক্ষিক সাড়া জাগানো আকাশে উটপাখি
স্বা- ধী- ন।
শব্দ বাজে না খাস কামরায়
চোখ পাতা আকাশ জানালায়
তারাদের নিচে রেখে স্বেচ্ছাচারী কুচকাওয়াজ
আমার

সাদা মেঘেরা পাহাড় পাহাড় ছেড়ে গ্রহান্তরের
বাতাসে ঝোলা ঝুলে
ভাসন্ত সময় ঝাপসা মেঘ - ঢেউ এর হাত টেনে
চুপি চুপি গুঁজে দেয় গোপন চিঠি
"হোল্ড ইয়োর টাং অ্যান্ড লেট মি লাভ "
হাতে দ্রাক্ষারস কানে ভূপেন হাজারিকা
তেত্রিশ কোটি দেবতার থান
পূর্ণাদ পূর্ণমুচ্চতে
বিকল্প ক্যানভাসে কাzaকি রমনীদের সান্ধ্যবিহার
তেলনগরীর বিলাসিত গম্বুজ কাঁচ
প্রতিশ্রুত রং বরফসাদা নীল হ্রদে
মাছ ধরে মতস্যবিলাসী পুরুষ
শূন্যে ঘরবাড়ি বাথরুম গীজার ভ্যাকুয়াম ফ্লাশ
কল্পিত লাইন সীমা জিও পলিটিক্যাল
জুলে ভার্ন, হাসানরাজা
"কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যের
মাঝার - "
বদলে যায় ঘড়ির কাঁটা। চাঁদকে চুমা খেয়ে
স্বপ্নের বাতাসে পানসি অতলান্ত দরিয়া - -
কূল নাই কিনারা নাই . . . . . .
রেড ওয়াইন কাবাবের প্লেট হাতে নিঃশব্দ
আকাশ বালিকা চুলের ফাঁকে আটকে রাখে সাত সমুদ্রের নীল পানি,
চোখের মণিতে সতেরো নদীর কান্না - শরীরে জড়ায় তারার সালমা
জরির অন্তর্বাস। জলদস্যুদের যুদ্ধ জাহাজ টপকে টপাটপ ফটোগ্রাফস্
ওসলো ফোর্ড, মার্কা ফরেস্ট - -
স্ক্যান্ডিনেভিয়ান চার্মিং গ্যামলা স্ট্যান - - শহর।
নিরাল উপনিবেশে নোবেল - গ্যালিলিও গ্যালিলির কন্ঠচাপা
শীতকার / চিতকার / ছিছিক্কার। কলম্বাসের স্পর্ধিত সফর একসময়
পৌঁছে যায় অনাবিষ্কৃত নতুন ঠিকানায়

শুভঙ্করের ফাঁকি ? চৌদ্দ = ৫ ১/ ২

সময়ের ভুলভুলাইয়ার জরায়ু গভীর ছাড়া একটি টসটসে সকাল নামছিলো মই বেয়ে।
দেখতে দেখতে আমিও পাখসাট মেলে পাক খেতে খেতে নামছি মাটির দিকে –
গন্ধময় মাটি - যেখানে মানুষ।প্রেম। আর্তি। আশ্লেষ। রিরংসা। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষ
সম্মোহিত নিদালি মায়ায় মুখ আঁকে। ডিলিট করে। মেমারি সেলে খড়কুটোর ঘোসলা বানায়।
সকালটা ক্রমান্বয়ে বড় - আরো বড়। স্যান্ডি ঝড়ের মিসাইল অ্যাটাকের তোয়াক্কাহীন হাডসন
বে - পদ্মরাগমণি সূর্য পাথর ভাঙা।
ভূমি স্পর্শের হর্ষতায় ডানা জোইয়ার কলম :
" ক্যান পোয়েট্রি ম্যাটার ?' '
স্টার বাক কফির উপচানো ফেনা : জীবন মাপছি কফির চামচে
পিঁপড়েদের অনুশাসনে মানুষেরা একদিন শিকলিত হাত পা
আসে যায় বিকোয় কথা কয় শ্রম দেয় দেহ খোলে মুলাতো নারী
রক্তে, বৃষ্টিতে ভিজেছিল কোন এক সকালে পৃথিবীর নাড়ি
বুড়ো ম্যাপল গাছটি হাওয়া দেয় ধরে রাখে সেসব বেত্তান্ত গূঢ় কতা
তেতো কফির স্বাদ জিভে গান গেয়েছিল জন হেনরি
সূর্যকে জামার হাতায় পুরবে বলে
দরবারী কানাড়ায় গিটার ছিঁড়েছিল পিট সিগার
"ইফ আই হ্যাড্ আ হ্যামার "
সুপ্ত গহ্বর ফাটিয়ে সঙ্গীত ফাউন্টেন কর্ড এ গর্জায়
খুনসুটি আলোয় দ্যাবাপৃথিবী
সরজমিনে তদন্তে
নামে ।।

সৌমিত্র সেনগুপ্ত- র দুটি কবিতা

অ্যাসাইলাম - ৪৩

তোমাকে দেখছে পাখিরা
ডাকনামে দেখা পরিচয়ে কি আন্তরিক
হয়ে উঠছে আরো একটা নাম

এবছর এভাবেই শীত
ডানার ঠিকানা বা কাছে টানা অপরিচিত মাত্রায়
যৌনতা
স্মৃতিফলক
কবিতা নামের সাজানো নগ্নতা

গতসন্ধ্যায় কুহু ডেকেছিল কেউ কেউ
খুলে রাখা এপ্রিলের রাত্রিবাসকে
গায়ে মেখেছিলো আরো দূরের হ্রেসারব
নীল অন্তর্বাসে
আরো নীল তোমার কাছে পৌঁছতে

দেখ . . .
অনুভবে কেমন রেঙে উঠছে কালো রাস্তাগুলো

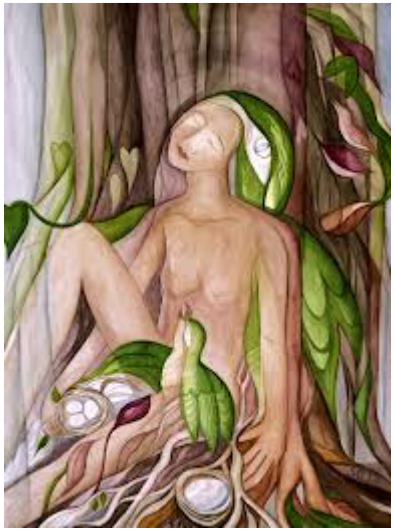

অ্যাসাইলাম - ৪৪

কোন শব্দ হয়নি
চিবুক থেকে স্তনের স্টেশন দূরত্বে গড়িয়ে যাওয়া পাথরে
ওটুকুই শিল্পিত

ওখানেই টেনে আনা আঁচলের কাছে কখনো বলেছি
না পড়ে রেখে দেওয়ার কথা
গৌতমী'র চিঠি
আর বছর ঘুরে গেলে না দেখা তোমাকে

ফিরো না
যে কোন আশ্রয় আজকাল তোমাকে নিয়ে যায় অন্য শহরে
বাতাসের পাতা আর ডাকঘর বৈকালিকে
ওদের কাছে ডাকি
সাপলুডোয়
সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে আর একটু যদি ঋতুকথন পাই

পীযুষকান্তি বিশ্বাস- এর তিনটি কবিতা

বুট

রক্ত মাখিয়ে যে দুটি পা দিয়েছিলে মাংসাশী বৃটিশের মুখে
র‍্যাডক্লিফের প্রতিটা কালির আঁচড়ে
ওরা তোমাকে উদ্ভিদ করে দিয়ে গেল

আঙ্কল বুটের তলাটা ক্ষয়ে গেছে
এবার ওটা চিলেকোঠায় তুলে রাখো

আর কত বদলাবে কদম?
জি টি রোডের পাশে যে সব ধুলো জমে জমে আজ
নন- ভেজ পাঞ্জাবী ঢাবা
রক্তের কালিতে লেখা হল ডপলার বানী
বুরি নজর তেরা মুহ কালা ।

বুট দুটো তুলে রাখো আংকল
পা দুটো এখানেই থাক
চলো ঘাস বনে, যেখানে চৈত্রের জ্যোৎস্না পুড়ছে স্বাধীন বাতাসে
যে পথে পড়ে থাকা ঝরা পাতারা উড়িয়েছে
পশ্চাদপসরনের পতাকা
এবার চলো বুকে হেঁটে
আমরা সজ্জিত হই মুখে, বুকে, বৈশাখী প্রান্তরে,
আটকে রাখি এ শতাব্দী, বসন্তের
পাহারায়, চলো পা- হারাই ।

অন্ধকার আঁধার

মেঘ জড়ানো রাতে
যে অন্ধকারগুলো ভেঙ্গেছিলো
আমার ঘুম রং দেওয়াল
জানলায় জানলায় এঁকেছিল হিংসুটে ভয়
ডানায় আঁধার জড়িয়ে গুটিসুটি আমি ছিলাম ছোট এক পাখি
বোধহয় শার্শী ঠুকরিয়ে ভেঙ্গেছি কাঁচ, মখমলের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে
বাগীচাতে ঢুকে গেছিলাম
ফুটিয়েছিলাম ফুল, অকালবোধনে ।

সেই যে পার করে গেছি গঙ্গা
তারপর আমি আর কোন সুড়ঙ্গ- মুখ দেখি না
কিংবা কোন গঙ্গোত্রীর জন্ম
শুধু আঁধার দেখি, কৃষ্ণপক্ষ রাত, ভাঙ্গা চাঁদের অর্ধগোলাকার বৃত্ত
বিন্দু আর ছায়ারেখা গুলি একে অপরকে জড়িয়ে কোন এক সুতোকাটা বুড়ি
আমার রক্তে অনবরত কেবল বাড়ায় শর্করামাত্রা ।

অথচ, অঙ্কুরোদগমের সেই তো মধুবন ছিল
কোন এক তরলীভুত প্রেম পত্রালিকা
উদ্ভিদ জীবনচক্রে এক গৃহবন্দী প্যানক্রিয়াস
যারা ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে যায় ত্বকের প্রতিটা কোষে কোষে,
কিংবা আমি যারা
নিকট অতীতে বা কাল
এখন তাদের গুংরে ওঠা কান্নার সাংসারিক এঁটোকাঁটা
কোন কোন ছাইগাদায় পুড়ে যাচ্ছি সিগারেটের সাথে
ভস্ম হতে হতে
শূন্য থেকে শূন্যে, অনেক শূন্যের ভীড়ে, ঝড় খুঁজে ফিরি. . .

আজ সে এক স্থিতিস্থাপক সামুদ্রিক আর্দ্র ও লবনাক্ত নিঃশ্বাসে,
যে আজ শুধু কেবলই নিঃশ্বাস
মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা তারা হয়ে ঝরে পড়ি. . .
কখনো, রোডসাইড পার্কের পাশে কোন ধুলোমাখা ফুল বাগীচায়,
বা কোন এক কৃষ্ণকলির পাপড়িতে শিশিরের সাথে শুয়ে শুয়ে রাত্রির আকাশে
সেই প্রাণ ভ্রমরার পদচিহ্ন খুঁজি
আর
আঁধারের ফোটন কণাদের সাথে আজও তাই
কোন এক ধুমকেতুর পুচ্ছ বরাবর মেঘ হয়ে উড়ে যাই।

বারুদের গন্ধ

বস্তুত রাত্রিকালীন গার্ডডিউটি সেরে ঘুমাতে আমার যাবার কথা
চোখে ভেঙ্গে আসছিলো সমস্ত পাহাড়
তাকিয়ে দেখছিলাম বৃষ্টির রং বদলানো
তুষারাবৃত কারাকোরাম।

আসলে ঘুমবাহী চোখ দুটো খুঁজছিল এক স্থায়ী হিমবাহ ঠিকানা
যেখানে রক্ত কণিকারা দানা বেঁধে হয়ে যেতে পারে মিস্টি জলের হ্রদ
কিংবা আগ্নেয়াস্ত্রদের শীতল সমাধীর উপরে
বিছিয়ে দিতে পারে এক বারুদের বিছানা।

ঐ বারুদ বস্তুটি মাঝে মাঝে আমার উর্দিতে গন্ধাক্ত হয়ে ডোরাকাটা দাগ
আমার কামঅফ্লেজের হেলমেটের স্ট্র্যাপে ময়লা সুতোয় লেগে থাকে নোন্তা আস্তরন

যার গন্ধে ছুটে আসে চেনাবের গলা পঁচা খাদে খাদে জন্মানো দলে দলে বোম্বাই মাছির ঝাক
ওরা এসে কোন ধরাশায়ী সৈনিকের নাকে
কিংবা বুকের পুঁজে ভরা ঘায়ের উপরে বসে
বুক ডন মারে।

আসলে এই সব মাছিরা খোলা বাজারের হোলসেল বিক্রেতা
আর এই সব ব্যাবসায়ীরা হল সেই হুন নেতা এটিলার বংশধর
যারা মাঝে মাঝেই মিহিরগুপ্তের মফস্বলের ফার্মহাউসটায় মাল খেয়ে ধামাল মাচাত
আর থকথকে বমি সহ লালা উগরাত, তাদের থুতুর স্রোতটা উপনদি হয়ে
এসে মিশে যেত বিপাশার রক্তবাহী স্রোতে।

কিংবা আমার মত যারা ষোল হাজার ফুট উচ্চতায় প্রাণের আহ্লাদে ক্যাম্প করছি
বেলুন ছেড়ে দিয়ে বাতাসের বেগ মাপছি
শতদ্রুর শ্বেতকায় বুদবুদের পাশে আজও কাগজের নৌকা বানাই
প্রকৃতপক্ষে , আমরা তো সেদিনই সাম্রাজ্যটা ভাসিয়ে দিয়েছি সিন্ধুর স্রোতে
ওদের রাজ্যপাটে আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহরা কাঠ কুড়াতে যেত
আর মধু ভেঙ্গে আনত
আমার মা ওদের বাড়ি বাসন মাজতে যেত
তেরটি বসন্ত ঘুরতে না ঘুরতেই তারপর একদিন
ওরা আমার মাকে গর্ভবতী করে দিল
খাদ্য সন্ধানে পেট উচু করে আমার মা তাও যেত গাংপারে
সিন্ধুর শ্যাওলা জমা ঘাটে পা পিছলে আমার মা পড়ে ও গেলে একদিন . . .

তারপর বহুদিন আমি কোন কবি কে কোন কবিতা লিখতে দেখি না

দশমাস দশদিন পরে মশারীর মধ্য থেকে
শুধু জন্ম নিল গান্ধর্ব শিল্প. . .

আমরা যারা দেখেছি পঞ্চনদির পাড়ে
ঘুম কাতর সিপাহীদের বাঁশের উপরে ঝুলে থাকা তাবু,
ক্যাম্পে প্রতিদিন ভনভন উড়ে আসছে অসংখ্য মাছিদের ঝাঁক
ওরা আমাদের বন্দুকের পাইপের উপর বসে গা ঘসাঘসি করে
কেউ কেউ ঠ্যাং গলিয়ে চেটেপুটে খায় অর্ধদগ্ধ বারুদের অবশিষ্ট
যেখানে কার্তুজেরা বহুদিন যুদ্ধবন্দী হয়ে হেগে মুতে গেছে।

ওরা কেউ কেউ আমার কানের কাছে গণসংগীত গায়
কেবল টিভি নেটওয়ার্কের খবর ও পড়ে কেউ কেউ. . .
ঘুমের পাহাড় ঠেলে
গুহামুখ থেকে আমি শুনি এক কৃত্রিম ঘুম ভাঙ্গানোর গান
বোধহয় কন্ট্রোলরুমের সেই ওয়েলিং সাইরেন হবে
পাহাড় গুলি যেন প্রতিধ্বনিতে খান খান হয়ে যেতে চায়
ঘুম গুলো গুড়ো গুড়ো হয়ে গান পাউডার

অ্যাংকলেট বুট পায়ে ভাঙ্গি ঘুমঘোরে পাহাড়ের চড়াই ,
আমারই পায়ের পিষ্ঠ হয়ে
আমার সেই ঘুমিয়ে নেবার স্বপ্নগুলো কাদা কাদা হয়ে যায়
তাল তাল অনেক আগুনের কাদা,
থক থক বিছিয়ে থাকে সমস্ত গিরিখাতে . . .

আমি তাতে পা দিই, হাত ডুবাই

কেয়া শেঠের ক্রিমের মত
তাকে আমি দলা দলা মুখে মাখি
চোখ বন্ধ করে, দু ঠোটের উপরে নিচে জিভ দিয়ে চাটি
ওখানে আমি যেন বারুদের গন্ধ পাই।

সুমন মল্লিক - এর দুটি কবিতা

নেগেটিভ্ / ৪

উন্নিদ্রায় সমস্ত গন্ডী পেরিয়ে
চলিত নিয়মে হয়েছি চশমখোর।
প্রত্যাকর্ষণের পয়মন্ত প্রদেশে
তারণ জোটেনি শাপমুক্তির।
ধ্বংসের নবান্নে দাঁড়িয়ে আছি
ঈশ্বরের বীর্য মেখে. . .
আমার আয়েসীর শবযাত্রায়

পুষ্পস্তন হাতে সামিল হচ্ছে
নগ্ন ক্ষারিতুন্মাদিনীরা !

সুনওবতনামা

বুকে জড়িয়ে ধর যখনই
বুকের যন্ত্রনাগুলো উবে যায়।
চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়া কস্তুরীর ঘ্রাণে
সিক্ত ও শান্ত হয় ক্ষারাসুখী মন।
ভুলে যাই আঘাতের স্বাদ ;
জিভাজিভিতে উন্মত্ত হই. . .
অমাদের হিংস্রতায়
সময়ে অসময়ে
নতুন নতুন পৃথিবী তৈরী হয়
প্রতিদিনের ঘরবাক্সে।

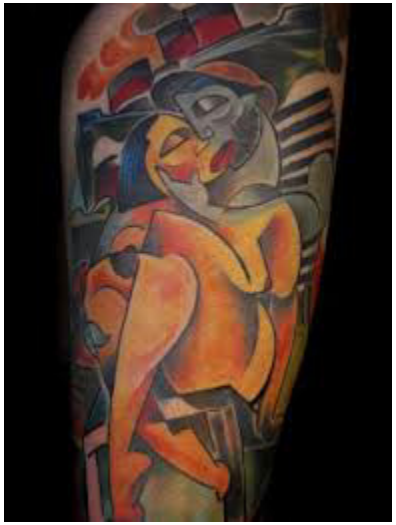

শুভাশিস ভট্টাচার্য - র কবিতা
অরুন্ধতি জরায়ু

মৃত তারাদের মিছিলে
দাউদাউ অরুন্ধতি জরায়ু
কবেকার বাসি আলোর সাথে
অনন্ত অগ্নিশয্যায়
ছড়িয়ে পড়ে চিতাভস্ম
অনেক আলোকবর্ষ পেরিয়ে
প্রাণের আশায় - লোহা রং মাটিতে
অন্ধকারে লাঙ্গলের ফলায় ইতস্তত জীবন
সন্ধানী আলোর বৃত্তে
অগ্নিদগ্ধ মাটি চিরে মাথা তোলে
কয়েকটা হাত,সরু সরু পা, কিছু আঙ্গুল

খানিক দূরে – একটা কান, অনেক চোখ, নাক, জিভ, ত্বক -
আর একটু এগোলেই–
অসম্বদ্ধ কিছু পাছা, কোমর, পেট, বুক, একটা স্তন -
উরুবদ্ধ অন্ধকার – মোলায়েম কিছু চুল - চরিত্রে খয়েরি
একটা নেপেন্থেস কলসপত্রী যোনি–
পেটের ভেতর গোলাপী অন্ধকার জারক রস,
একটা বিচি, অসংখ্য রোঁয়া ওঠা পুরুষাঙ্গ–
একশোটা পা নিয়ে – বেমালুম ডুব দিয়ে মরে গেলে
ততক্ষণাৎ শুরু হয় তদন্ত
আমাদের নখ, দাঁত, স্কাল্পেল্ –
লাশকাটা ঘরে আমাদের ফুলে ওঠা পেট,
ফুসফুস ফাঁক করে - কাটা ছেঁড়া – শেওলার খোঁজ।
বসে বিচার সভা - ঘোষণা হয় মৃত্যুদন্ড -
নিস্তব্ধে নেমে আসে অসংখ্য ফাঁস -
আমাদের বকের মতো ঘাড়, বড় বড় চোখের তারা,
অল্প খোলা ঠোঁট, উঁকি মারে ফুলে ওঠা জিভ,
গড়িয়ে পড়া লালার দাগ, মুষ্টিবদ্ধ হাত, মাটি ছুঁয়ে ফেলে
মাঙ্গলিক পায়ের পাতা সরল সুরেলা দোলনে।
আর সাথে সাথে জ্বলে ওঠে আগুন
পুড়তে থাকে মাটি, জল, আগুন,বাতাস ও আকাশ,
পুড়তে থাকে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ,
সন্ধানী আগুনের বৃত্তে
দাউদাউ জীবন, জ্বলন্ত কয়েকটা হাত, সরু সরু পা, কিছু আঙ্গুল,
খানিক দূরে - অগ্নিদগ্ধ একটা কান, অনেক চোখ, নাক, জিভ, ত্বক,
আর একটু এগোলেই -
ঝলসে ওঠা কিছু পাছা, কোমর, পেট, বুক,
একটা স্তন, উরুবদ্ধ অন্ধকার -
মোলায়েম কিছু চুল,
পুড়তে থাকে কমলিকা ও অরুনেশ্বর

একটা নেপেন্থেস কলসপত্রী যোনি
একটা বিচি, অসংখ্য রোঁয়া ওঠা পুরুষাঙ্গ
পুড়তে থাকে উলঙ্গ কঙ্কাল ইতস্তত জীবনের ধোঁয়ায়
গর্ভবতী অরুন্ধতি জরায়ু
অহল্যা প্রতিক্ষায় আলোকসম্ভবা।

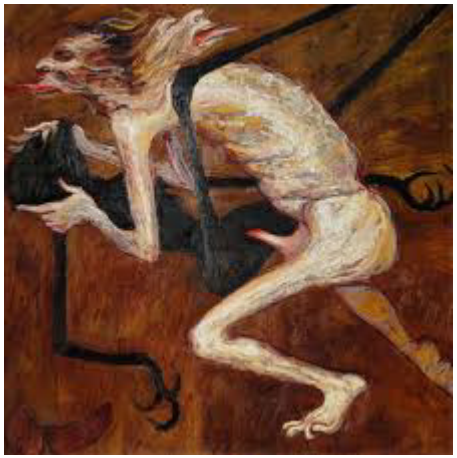

দীপঙ্কর দত্ত- র দুটি কবিতা

ট্রপিক অফ ভার্গো

পেঁজা দিঙবারণেরা সূঁইফোঁড়ে নিঙড়া বুকনি ফুটছে পশমিনা। আইস্যোবইস্যোজন
বলতে বীথিকার ডুরে উড়িপুড়ি রোদ আর সীশোর শরাবার স্কুপ স্কুপ বালুরন্ধ্র থেকে
গা ঝাড়া দুলকি কাঁকড়া ও তাদের ফিঁয়াসে শর্মিলী। নথ আর টায়রা খোলার আঙুলের
পা পা চৌর্য সন্তর্পনে থোল থোল সীগাল মাংস উড়ে যায় পারাবার। একান্ন জিভের
বঁড়শি ডুবে মরে অনুষ্কার হেয়ারি পাফি গোস্পদে –

সকালে গৌরব এলো। উদভ্রান্ত। চায়ে গোনাগুনতি দুচুমুক। রাম্প্ল টাম্বল ছুঁলো না । ১৫ই এপ্রিলের ট্রানজিট রিপোর্টটা চাইতেই আমি প্রথমে একচোট হাসলাম, তারপর সিরিয়াস হওয়ার ভান করে বললাম এভাবে চললে তো তুমি অসুস্থ হয়ে পরবে হে ! অষ্টম ঘর থেকে দুই ফায়ারি প্ল্যানেট মঙ্গল ও কেতুর সঙ্গে রোমান্টিক শুক্রের কম্বাইন্ড গোচর নিঃসন্দেহে প্যাশনে চার চাঁদের আগুন। নবম থেকে বৃহস্পতি ওল্টানো চায়ের ভাঁড় চুকিৎকিৎ ঠেলতে ঠেলতে আখ্যানকাব্যের এস ইএস বিহীন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার কাৎরাকাৎরা ডেটেলগন্ধী আলতা ডিঙিয়ে নিচ্ছে চৌকাঠ। শুক্র তিনটে ন্যাচারাল ম্যালেফিকের কবলে একটা ফাংগাল নিম্ফোম্যানিয়াক স্যান্ডউইচ। দ্বিতীয়ের রাহু - - স্ক্যান্ডালাস অ্যাফেয়ার। কিন্তু দ্যাখো, সূর্যের ক্লোজ ভিসিনিটিতে বসে মঙ্গল আর শুক্র দুটোই কিন্তু কম্বাস্ট ! বক্রী হওয়ার ফলে শনির দৃষ্টিও ফিকা পড়ছে অষ্টম থেকে ! আর যদি সেদিনের দশম স্থানের চাঁদটাকে ধরি তো দেখছি ওটা পুণ্যিপুকুরে লাট খাচ্ছে পানকৌটি ! ফলে তোমার আশঙ্কা মিথ্যাও হতে পারে। আর তা ছাড়া, তুমি নিজেই তো ফোনে বললে, সে সময় ও নাকি রজস্বলা !

আপনারা প্রত্যেকে ব্যাহকি ব্যাহকি বকচোদী করছেন, আলো ফেলতে পারছেন না ! পেনিট্রেটিভ সেক্স না হলেই কি সাত খুন মাফ ? আমি নিজে দীঘা যাবো। প্রয়োজনে হোটেল ম্যানেজারকে পয়সা খাইয়ে জিজ্ঞেস করবো অনুষ্কা আর জয়ন্ত ভৌমিক সেদিন রাত্রে রুম শেয়ার করেছিলো কি না !

এনেথ স্যাঁকড়ার মোহরকাটা গোধূল। জড়ো কাঠকুটোয় আগুন স্লিট হলে ফিনকি দেয় গ্লোবিনহীম লহুলুহান পাখি। কাম্ অন্ অনু, ওঠো ! হোটেলে ফিরতে হবে ! আমি চাই না আমাদের সম্পর্কটা নিয়ে কোনো নুক্কর বহ্যাস হোক !

জানে আবার কে না ! ব্রেকফাস্টের পর আমি যখন নরএথিস্টেরনের স্ট্রিপটা ছিঁড়ছি অদিতি এসে হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নামটা পড়েছে। তুমি আমাকে ২১

দিনের কোর্স কেনো করতে বলছো জানি না, যখন আমরা কালই রওনা হচ্ছি !
জানি না পীরিয়ডটা শুরু কতদিনে হবে আবার!

হুক খুলে প্রবেশিকা ব্রাউজ করি আর অস্ফুট চন্দ্রবিন্দুরা গুটকাখোর গস্তানি বিসর্গ হয়ে ওঠে। বাঁয়ে গিয়ে টি- পয়েন্ট থেকে বাঁয়ে বামহাতি প্রথম রুমটা আই সি য়ু পরেরটাই সাহেবান কোঠার বাইরে দেখবেন পাঁচিলে তোষকের ধুপছাঁওয়ে শচীন কত্তার বেলাহাজ চতুর্বিংশতি বৈঠার ঢেউ, চাঁদিয়াল বিষ গ্যাঁজলায় উবু চাটতে নেমেছে ফেউ লাগা চকরাবকরা বাঘ, পায়ের গোটানো কেন্নো উল্টি পাক খেয়ে দাঁড়া কেঁচকির গাছে কাঠেঠাকরা কল্কা তুলেছে ফাক্সি ফাক্সি ফাক্সি ফাক্সি ফাক্সি ফাক্সি ডার্লিং ফাক্ মি - - -

সাপবাক্য

ট্রেন চলে গেলে যখন থ্যাঁৎলানো ইস্পাত যমজে জোছন ঝকঝক করে
গুমটির সাপযুবতীদের ড্রাগ ওভারডোজ ও ঘুঁটির ম্যাচিং বিন্দিয়ার ওপর
গড়িয়ে যায় ঘুণফোঁপরা একটি ছক্কা - -

শীতে সাপ পেটিকোট কে পিস্যু, থুৎকারা চিকনি খোলশ ও মোরগফুলের
ধুনি জ্বালিয়ে স্যান্ডেলে বাতাস ফটফটিয়ে কাচ্চি গুলাবী নেরোল্যাক এলো
ভালভার মেলডি চকলেটি টাইমলাইনে - -

বুড়ো সমুদ্দুরের হেমিং ওয়ে আউট ছাড়া সাপেরা যখন কোনো হানিমুন স্পট
খুঁজে পায় না আর এদিকে ভল্ভোরা ছাড়ি ছাড়ি, কাঁকই ছেঁকে ইশ্চেমিক আলো
এলো আরশিনগরে, নেউল সাজনার ট্রিন বাইসিকলের সিঁথিপথে - -

ঢেলারা স্কিপিংয়ে উছাল উছাল খানিক আলগা হলে সেমিজসহ নিড়েনিতে
ফাটিয়ে ছেড়ে দিয়ে দেখছি রাজ কোব্রাদের উষ্ণীষ র‍্যাকেটে পিংপং
এ কোর্ট ও কোর্ট ধ্বজ্জিয়া উড়ছে তাদের মলেস্টেড আধর্ষপত্র - -

ফেকু তক্ষকদের শ্লোগানে আজকাল হর হর প্রিফিক্স বসে না, উল্কিগুলো জীবন্ত
সাপ হয়ে আস্তিকের আস্তিন ও হোয়াটস্অ্যাপের দুধ- কলায় পাঁচ পা শিকড় চারিয়ে
যায় আর একদিন চমড়িতে দগদগ করে ওঠে কেতকা ক্ষেমানন্দর কাউন্টার ট্যাটু - -

স্নেক চার্মারদের ভেঁপুর ভেতরে ব্লাডারে পেচ্ছাবের কেলাস যখন সাপেরা
অহো একেকটি চার্মিং শীতরাত ঘুমিয়ে ওঠে তাদের ল অফ ডিমিনিশিং রিটার্নস
বোঝানো যায় না, স্মোকি বাণলিঙ্গ ভেঙে পড়ে মূলাধারে - -

কুলিক সেফোলজিস্টদের হেপাটাইটিস, ঝাঁপি থেকে ট্যারো কার্ড উল্টে উল্টে
চ্যানেল সামলাচ্ছে ভূঁইচিতির একগলা খ্যামটা, বালুরঘাট থেকে র‍্যাম্প খুঁজতি খুঁজতি
শেষে পেণ্ডুপাছা ব্রিগেড এয়েচো ! দিল্লী মারাগে যা, রামলীলা, যন্তরমন্তর - -

---

কবিঃ এক আশ্চর্য্য বধির

(বন্ধু সোম আর শৈলেয়ী সরকারকে)

রমিত দে

কিছুদিন আগে ফেসবুকে এক ‘শব্দোত্তীর্ণ’ মানুষের সাথে আলাপ। ভার্চুয়াল ফ্রেন্ডশিপ থেকে শুরু করে ভাবনার উজানধারা বেয়ে বেশ কিছু কথা এবং শেষমেশ আবিষ্কার শব্দহীন এক জলহাওয়ার মালিক তিনি। জন্মবধির। না, ‘শব্দোত্তীর্ণ’ শব্দটা ব্যবহার করার কারণ সে জন্ম- বধির বলে নয় বরং কোথাও যেন শব্দকে হারিয়ে দিতে দিতে সেখানে শব্দহীন এক অদ্ভুত অবগাহন, শ্রুতির চেয়েও সেখানে আত্মজ হয়ে আছে অশ্রুতের অন্য কোনো সহজ দর্শন। ব্যক্তিগত এক বিস্ময়ের সংসার। সে কবিতাও লেখে। মাটির ভেতর মুগ্ধতাকে পুঁতে রেখে কবিতাগ্রামে ঢোকে। ভাবছিলাম দৈনন্দিন কথনবিশ্বে এই যে কেউ ভাবছে কেউ শুনছে কেউ লিখছে এই যে প্রত্যুত্তরের এক থেকে অন্যরূপের ধারনা বয়ে বেড়াচ্ছে শব্দের সন্ধানী দৃষ্টি, সেখানে নৈঃশব্দ্যের ভাষাতত্ত্বে দাঁড়িয়ে তার মাথা মুখ শরীর এবং চারপাশের শব্দের অন্তক্ষরা গ্রন্থি আর হার্দ্য রসের ছবিটা ঠিক কেমন? কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম কেমন হতে পারে এই না-শব্দের অন্বেষণ ? আমাদের এই কবিতাগ্রামের নায়ককে ঘিরে শব্দরা অক্ষরেরা শ্রুতিরা কি তবে শুকনো তামাক পাতার মত খসে পড়ছে! ধীর। ধূসর। শব্দহীন! শব্দের শরীর সেখানে কেমন! ধ্বনির সাথে কেমনই বা তার স্বাস্থ্যাবাস! উঠোনের তারে ঝুলছে সদ্য সাদা কোনো এক অভাবনীয় নিভৃতি! নাকি আমাদের উনুনে হেঁশেলে প্রতিনিয়ত ‘আমি’ নামক একটা চিহ্নকে চেনাতে যে শব্দ পোড়ানো হচ্ছে, দৃশ্যকে রিট্রিভ করতে শব্দের রিপ্রেজেন্টাল ধোঁওয়া

বাড়ানো হচ্ছে তেমনই কোনো জ্বলন্ত দগ্ধ জীবিত কোনো শব্দ চিরে দিয়ে যাচ্ছে শূন্যতার অবাধ জগত! কিংবা অতিজীবিত অন্য কোনো অপর –কথা শেষ হলে বুদবুদের মত ভাসছে যার কথা, শোনা শেষ হলে শ্রবণকে ঠাট্টা করছে যার কান। একটা একেবারে না শোনা জগত আর তাকেই একটা মানুষ তার কৌতুক অবধি অতলতা অবধি লাই দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত অক্ষরে আলোতে।

ধরা যাক আমাদের নায়কের নাম সোম। ধরা যাক সোমের দিকেই তীব্র বেগে কালো একটা ঘোড়া ছুটে চলেছে অথবা অশ্বারোহীর চাবুকের আঘাতে ঘোড়াটির চামড়া থেকে দরদর করে নেমে আসছে পরম শূন্য ঘন গাঢ় লাল রক্ত। অথবা মিঠে হাওয়ায় গাছের ভরা আকার থেকে মাটি ছুঁতে ধূসর ধূসরতরে গড়িয়ে নামছে কোনো সাবালিকা পাতা, প্রজননের নাচ থেকে পরম নৈবেদ্যে ফিরে চলেছে পাতাটি –তাদের স্বপ্ন তাদের স্নায়ু তাদের জীবনপিপাসার তীব্রতাকে আমরা তো শুনতে পাচ্ছি। সোম কি শুনছে? কাকে বিষয় করছে সোম ? কি থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে ? কথা বলে যেটুকু বুঝলাম বিভিন্ন তরঙ্গের শব্দ বা বিভিন্ন তীব্রতার শ্রুতি বলে সে অর্থে ওর কাছে কিছু নেই, যা আছে ছোটবেলায় মায়ের গলায় হাত চেপে বুঝে নেওয়া কম্পনের কিছু ধারনামাত্র, আর দৃশ্যানুযায়ী রেফার করা কিছু প্রতিশব্দ। অর্থাৎ রোগা মোটা কিছু অনুভবমাত্র, টুকরো টুকরো কিছু অনুমান। অর্থাৎ ধ্বনির জায়গা সেখানে ধরে নিয়েছে শূন্যতা। আর এই শূন্যতার সাথে সে মেলাতে চাইছে শব্দের প্রতিকল্প মেলাতে চাইছে অতিচেতনের পদক্ষেপ। ভাষিক পৃথিবী তাকে দিয়েছে একটা সাদা ক্ষেত্র আর কয়েকটা মোটা দাগের শ্রাব্যিক ধারনা। কিন্তু যা আমরা দেখতে পাচ্ছিনা তা হল বিরোধিতা, অপ্রাপ্তির বারংবার বিরোধিতা, অশ্রুতকে শোনার অসহয়তা, অশ্রুতকে চেনার বিস্ময়। আর হয়ত এই নৈঃশব্দ্যের কাছেই লুকিয়ে কবির কাঁচা পংক্তি, কবিতার কুমারীত্ব। প্রাথমিক দিক দিয়ে দেখলে সোমের কাছে শ্রুতি ঠিক কেমন ? খুব জোরে বৃষ্টি হলে ঝরঝর এবং ধীর বৃষ্টি মানে টুপটুপ, তীব্র হাওয়ায় মুচড়ে যাওয়া পাতার চলাচল শরশর আবার চৈত্রদুপুরে মায়া ঢেকে রাখা পাতার দোলন পতপত- এমনই কয়েকটা শব্দধারণা তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে শৈশব থেকে শ্রুতিকে বোঝার জন্য আর বাকিটুকুতে তার নিজস্ব ধারণার ওপর নামিয়ে রাখা হয়েছে একাধিক তর্ক অথবা একটি মাত্র বিশ্বাস। বাকিটুকু তার নিজের। এই বিশ্বাসের ওপরই থীতু হচ্ছে একটা pyramidal silence । অর্থাৎ এর বাইরে যেটুকু, সেটুকু রহস্যময় সেটুকু অনন্ত সম্ভাবনার, আর সেটুকুই নির্বাক সংক্রমণের - দূরের ভূগোল থেকে তা উড়ে আসছে কবির নিজের দ্রাক্ষাপুঞ্জে, প্রকাশিতব্যের বাইরে শূন্যের পর্দায় গড়িয়ে দিচ্ছে নীরবতার রস। এই নীরবতার এই নৈঃশব্দ্যের আক্ষরিক সত্যতা কতখানি? কে বলবে? আমরা, যারা শুনতে পাচ্ছি জ্যান্ত শব্দদের নাকি যিনি শব্দকে এগিয়ে দিলেন নৈঃশব্দ্যের দিকে! আসলে নীরবতার মাঝেই তো রয়েছে অনেক ছবি অনেক ইশারা, ক্ষুদ্রতার গন্ডির বাইরে আসা প্রবুদ্ধ চেতনা। এখন এই নীরবতার দর্শনের কাছে এসে ভাষাকে আমরা কিভাবে খুঁজব? অশ্রাব্যের মাঝে শ্রাব্যকে কিভাবে চিনবে কবি ? অর্থাৎ কিছু একটা মেটাফিজিকাল সাবজেক্ট সর্বদা কবিকে নতুন করে রাখছে। তাকে দিচ্ছে নতুনের নিয়ম, নেড়েচেড়ে দেখছে আনন্দের পরিচর্যাকে। আর এখানেই কি আমরা ভিট্‌গেনস্টাইন (Wittgenstein) এর "Tactatus logco philosophicus" এর না-তত্ত্বের কাছে দাঁড়াতে পারি-! "Where in the world is a metaphysical subject to be found?- You will say that this is exactly like the case of the eye and the visual field. But really you do not see the eye.- And nothing in the visual field allows you to infer that it is een by an eye" – হ্যাঁ কেবল চোখ না, কানের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য, প্রযোজ্য বোধের সার্বিক বহুত্বে। উপস্থিতিকে অতিক্রম করে সে অনুপস্থিতির কাছে খুঁজে চলেছে অনুভূতির পত্রসম্ভার। অর্থাৎ একটা বিশ্বাস, ক্লান্তিহীন জেগে থাকা নীরবের সরবে। কবির কাছে জীবন্ত পৃথিবী তো এই একটা বিশ্বাসই। এই একটা না- থাকার রসায়ন।

‘বিশ্বাস’! ! ! -

হ্যাঁ, বিশ্বাস শব্দটার কাছে এসে আমরা থামলাম।

তবে কি শ্রুতি কেবল কিছু বিশ্বাস! যা ধরা পড়ছে, কবি যাকে ধরে নিচ্ছে শব্দ বলে সমবায় বলে কেবলমাত্র কিছু বিশ্বাস! ধ্বনির সাথে শব্দের, অর্থের সেখানে এক অনন্ত অনির্বাচন। কিছু অস্তিহীন কম্যুউনিকেশন! অর্থাৎ শ্রুতি একটি বস্তুর বা একটি ব্যবহারের আকারকে নিদির্ষ্ট করে ঠিকই কিন্তু তারই ভেতরে কোথাও রয়ে যায় বেড়ে ওঠার একটা প্রক্রিয়া। স্থির দৃশ্য থেকে শ্রাব্য থেকে বিবিক্ত হয়ে দ্রষ্টা হওয়ার বিশ্বাস। বিশ্বাস জিনিসটা ঠিক কি? ‘‘A belief is a functional state of organism that implements or embodies that organism’s endorsement of a particular state of affairs as actual (Mckay & Dennett)’’- অর্থাৎ ‘আছি’ অথবা ‘আছে’- এই বোধজনিত অহংকার থেকে বেরিয়ে একটা বহুস্বরের বোধে আত্মনিক্ষিপ্ততা। অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান পর্দাথের কোনো স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা নেই; সে অপর স্বত্ত্বার জন্য, নিজের শরীরে ধরে রেখেছে অন্যের প্রতিবেশী। এই ছুঁয়ে দেখা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ছায়া আর অনুকরণ ব্যতিরেকে আর তো কিছুই না। এই কি তবে প্লেটোর সেই স্বত্তা আর ভবন! বিংগস এন্ড বিকামিংস? গুহার দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে বসে আছি আমরা আর যা দেখছি তা কেবল পেছনের প্রকৃত ও নিশ্চিতের কলকোলাহলময় ছায়ামাত্র! শব্দও তো সেরকম। শব্দের লতানো প্যাঁচানো স্পাইনাল কর্ডটিকেও কি তবে আমরা ভরিয়ে রেখেছি কেবল মাত্র কিছু আত্মময় ধারণার কাঁচামালে? যার মিথ্যাদৃষ্টি পেরিয়ে টুকরো টুকরো সংজ্ঞা পেরিয়ে নৈঃশব্দ্যেই সমগ্রের অবগাহন। যেন এক ধরনের কুয়াশা –সমগ্র বানাতে অথবা সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে।

স্পোটের স্বরূপ বা Doctrine of Ideas এ যেখানে সক্রেটিস বলছেন যা জ্ঞানের গোচর তাই বিদ্যমান আর যা অগোচর তাই অসত্য অবিদ্যমান তাতে যে শব্দ তুমি শুনতে পেলেনা সে শব্দের সর্বাঙ্গীনকে অনুমান করবে কিভাবে ! কিভাবে দৃশ্যের বাইরে শ্রুতির বাইরের দেহটিকে দেখবেন কবি! আর এখানেই চলে আসছে প্লেটোর স্পোটবাদ। যেখানে স্পোটের স্বরূপকে ভেদ অভেদ একত্ব বহুত্ব নিত্যত্ব ও চলত্বে মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফুলের একটা ‘‘ফুলত্ব’’ পাতার একটা ‘‘পাতাত্ব’’ বা শব্দের একটা ‘‘শব্দত্ব’’ নামের মূল স্ফোট বিদ্যমান সেখানে, বিচিত্র ও বিবিধ হওয়ার আগে সেখানে একটা বিশাল একক ধারনা বর্তমান। অথচ এই এককের কোনো স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা নেই মানে এর সত্ত্বা অপর সত্ত্বা সর্ম্পকে আপেক্ষিক। অপর সত্ত্বাই এর অভিপ্রায়। দ্বিতীয়টিতে যা সত্ত্বা (being) প্রথমটিতে তাই ভবন (becoming) অর্থাৎ দ্বিতীয়টিতে যা আত্মপ্রতিষ্ঠ প্রথমটিতে তাই অন্যসাপেক্ষ। অর্থাৎ ভাষার পৃথিবীতে শ্রুতির পৃথিবীতে শব্দ আর ভাষার বাইরেও দেওয়া হয়েছে একধরনের রূপান্তরের, বিকিরণের স্বেচ্ছাচারী এরিয়া যেখানে শাশ্বত জড় পরিণত হতে পারে জায়মান শূন্যতা অবধি।

সত্ত্বাকে গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে সত্ত্বাকে অস্বীকারের এক জাতীয় পরম নির্বাণের দিকে। কবির কাছে এই সেই মুক্তভূমি যেখানে কবি নিজেই নিজের আততায়ী। সোমের মত যিনি জন্মবধির তার কাছে অক্ষর বা শ্রুতি তো অন্তর্যামী নন বরং আত্মার অনুদর্শনেই জগৎকে সে চিনতে চাইছে শূন্যের মত এক পূর্ণের আবেশে ঠিক যেমন একজন কবি একজন শিল্পী তার শাব্দিক জগতে যা দেখছেন তা কেবল আশ্রয় অবলম্বনমাত্র, আর এই পরিদৃশ্যমান জগত বা অবজেক্টটিভ ওয়ার্ল্ডের বাইরেও রয়েছে এক অনন্তের পরিমন্ডল সেখানে একটা কবিতাকে তিনি শব্দের অক্ষরের ধ্বনির দেহ থেকে ছিনিয়ে এনে বিদেহভাবনায় অভ্যস্ত করাচ্ছেন, দানা বাঁধার আগেই ক্রমশ অস্পষ্ট করে দিচ্ছেন, কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিচ্ছেন অতিক্রম করিয়ে দিচ্ছেন নতুন এক বিস্মরণের দিকে।

বর্গমালার বাইরে দাঁড়িয়ে শোনবার এই ব্যপারটার কাছে বারবার ফিরে আসি এক নিঃস্ব দর্শন নিয়ে। সোমের কাছে এসে যখন শুনি শব্দ নয় কেবল অনুরণন এমনকি অনুরণনও নয় কেবল কিছু অনুরণিত বিশ্বাস কেবল কিছু কম্পনের দিব্যদর্শনই হয়ে ওঠে ওর কাছে বেঁচে থাকার স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার ভেতর ঢুকে পড়ার কিছু প্রবাবিলিটি তখন ভাষার শব্দের আদর্শ প্রকল্প সম্পর্কেই অবশ্যম্ভব আরও একটা দরজা খুলে যায়। সোম কবিতা লেখে। কবিতা পড়ে। সোমের কাছে শ্রাব্য নেই অথচ শব্দ আছে। অথবা শব্দ নেই।স্ববিরোধিতা আছে। কবি কি তবে এই অনবহিত শূন্যকেই বেআব্রু করতে চাইছে প্রত্যহ তার নিজস্ব আঙ্গিকে? নিজস্ব শব্দের পাশে খুলে রাখছে সারাদিনের এক নৈঃশব্দের জানলা ? ‘পাখি’ শব্দের শ্রবণ সোমের কাছে ঠিক কেমন ? কেমনই বা পাতা পাতালির সাজমহল! কথা বলে বুঝতে পারলাম ওর সমস্তটাই চুরি হয়েছে কাছের মাপের কিছু স্বরবর্ণে; শ্রবণযন্ত্র ছাড়া পাখি ওর কাছে আসে ডানার আকারে আর শ্রবণযন্ত্র নিয়ে Aa- ii ডাকে । অর্থাৎ পাখি নাড়ালে শুধু পালকের গুঁড়ো। মাঝে মাঝে ভাবি ওকে তবে কত উঁচু হতে হয় পাখিকে ছুঁতে! আকাশ লেগে গেলে অনুপমে উঠে আসে কেবল Aa- aa- a এর মত দাঁড়িহীন কমাহীন ‘দুরের মাপের’ মত কিছু। শ্রবণের কাছে দাঁড়িয়ে ম্যাজিক মাশকারা ছাড়া এ আর কি? একটা পুরো জীবন একটা পুরো শোনা একটা পুরো সত্যকে অন্বেষণ করতে যখন এত কোলাহল এত কেওস এত তর্ক এত গবেষণা তখন কেবল পাঁচটা স্বরবর্ণের সংবেদনীতে সৎ- চিৎ- আনন্দের সংজ্ঞা উঠে আসছে। জবানীকে অনুসরণ করছে জায়মান কিছু নৈঃশব্দ্য আর আমি অনুসরণ করছি ওকে। গুটি খুঁজছি গাছপাকা খুঁজছি যাপনের। চেষ্টা করছি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা পৃথিবীর মাঝে ওর বেঁচে থাকার অ্যাকোয়াস্টিক অ্যানালিসিস অবধি পৌঁছতে। এবার জানতে চাই গজখানেক শব্দ দিয়ে শ্রুতি দিয়ে কোনও একটি কবিতা ওর কাছে কিভাবে sinsign হয়ে ওঠে-

“দু একটা অদ্ভুত রাস্তা থাকে

দু একটা ফাঁকা বহির্ভূত রাস্তা

দু একজন ধূ ধূ করা লোক থাকে সেই রাস্তায়

যারা ফেরে না, ফোকরে তাকায় না

- - - - - - -

একটা কার কুকুর যায়, পেছনে পেছনে লোক

মাঝ বালতিতে যা নেই সেই মৃদু জলের শূন্য ”

কবি স্বদেশ সেনের বহুল প্রচলিত কবিতাটা দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম ওর কানে লেগে থাকা সাদা সাদা অক্ষরের ভয়েড সেন্সটা।আর ও আমাকে মুখোমুখি করাল বিরামহীন উৎপাদনের। এ তো কোথাও আমাদের এতসত শব্দ এতসত উচ্চরোল সমবায়ের বিরুদ্ধে রীতিমত বিদ্রোহ ! স্বরবর্ণের ভয়াবহ স্বৈরাচার আমার ভাষাতাত্ত্বিক মাথার ভেতর পুঁতে যেতে থাকল কবিতার মহাকাব্য।এতদিন তবে শব্দ দিয়ে কি করছি? ধামা চাপা দিচ্ছি নৈঃশব্দের ঘোরকে! তবে কি কবি সেই প্রত্যাশিত বধির যে জ্যান্ত শব্দ দিয়ে নীরবতার ভাষাতত্ত্ব খুঁজে পেতে চাইছে! সোম জন্মবধির, ওর কাছে শ্রুতি কেবলমাত্র স্বরবর্ণের আকারে ধরা পড়ে, যেমন স্বদেশ সেনের কবিতাটার ছাল কঙ্কাল খুলে কোটর অবধি ও আমাকে বুঝিয়েছিল এভাবে-

“উ- এয়া অউ আ- আ (আই- আ) আয়ে

উ- এয়া আ- আ ওয়িও আ (ই) - আ

উয়েও উ উ ওয়া ও আয়ে এ (ই) আ (ই) আয়

আ- আ এ- এ আ ও- ওয়ে আ- আয় আ

- - -

এয়া আ উ- উ আয়(ই) … এওয়ে এওয়ে ও

এ কেবলমাত্র কোনো এক বধির শিল্পীর কাছে তার ভাওয়েল ফিল্টারেশন না বরং আমরা যারা নিত্য প্রকৃতি থেকে শব্দকে নিচ্ছি ইন্দ্রিয় দিয়ে ঘষে ঘষে সাদা করছি তাদের কাছেও এক অকথিত শূন্যতাকে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা। অর্থাৎ স্বরবর্ণের বাইরে শ্রুতি আমাদের কোনো নিশ্চয়তা দিচ্ছেনা। খুব ধীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে স্বরবর্ণগুলো কোথাও যেন শূন্যতার শরীরকেই ধরে রয়েছে, মিউট করে রেখেছে অবজেক্ট একজিস্টটেন্সকে। ভার্বাল একটিভিটিসগুলোর অভাবের ভেতর, ফোনেটিক পজের ভেতরই কোথাও শূন্যতা শরীর হয়ে উঠছে প্রতিনিধি হয়ে উঠছে। ভাষাতত্ত্বে Hiatus- filling বলে একটা শব্দ আছে। Hiatus শব্দটির ল্যাটিন প্রতিশব্দ গ্যাপ- ফাঁক, যেখানে বলা হচ্ছে দুটো স্বরবর্ণের মাঝে সবসময়ই একটা অনিশ্চিতির ফাঁক রয়েছে আর তা ভরাতে কখনও ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে ভরা হচ্ছে অথবা সেমিভাওয়েল আনা হচ্ছে ভাষার শব্দের রিপেয়ার স্ট্রাটেজি হিসেবে। আর ব্যঞ্জন বা আধাস্বরবর্ণের মাখামাখিতেই শ্রুত হচ্ছে শব্দের উদোম সাদা শরীরটা; কিন্তু কবির তো দরকার শ্রুতির সীমানা পেরিয়ে সংরক্ষণের সীমানা পেরিয়ে একটা ডিসকনটিন্যুইটি অবধি যাওয়া, তলিয়ে যাওয়া। স্মৃতির সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে শূন্যতার ওপর জোর দেওয়া। আর এখানেই এসে পড়ে স্বরবর্ণের দাদাগিরি, এখানেই সোমেরা রাজ করে, কবিরা বধির হয়, সবাইকে ডাক দিতে কবিকে বধির হতে হয়। অভিজ্ঞতা সমস্ত জ্ঞানের উৎস অথচ সেই এম্পিরিক্যাল রিয়েলিটিকেই কানের বয়সে একা রেখে কবি এগিয়ে যান কিছু অতিচেতনার দিকে কিছু ছলকানো নীরবতার চরণচিহ্নের দিকে।

শৈশব থেকেই অনুকরণ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি আর অন্য পশুর থেকে মানুষের সুবিধা হল এই যে সে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি অনুকরণকারী জীব, অনুকরনের মধ্যেই তার শিক্ষার শুরু। অর্থাৎ শিল্প মাত্রই কোথাও প্রাথমিকভাবে প্রকৃতজ কিছু অনুকরণ; প্রকৃতি থেকে পথ থেকে প্রসংগ থেকে প্রতিরূপ দর্শনের বুনো ফাঁদ তৈরী করা। এবং এ সবকিছুর সাথেই দৃশ্যজ ও শ্রাব্যের একটা সুস্পষ্ট সহযোগিতা স্বীকৃত। ১৯৪৯ এ শ্যানন আর ওয়েভারের কম্যুনিকেশন মডেল বানিয়েছিলেন, যাকে সংক্ষিপ্তভাবে SMCR MODEL বলে। বেসিক সিকোয়েন্সটা হচ্ছে-

Source =>

Message =>

Channel =>

Receiver

এখন এই প্রকল্পনাকে আমরা যদি কবিতার ক্ষেত্রে অনুসরণ করি দেখব সোর্স এখানে বাহ্যবিশ্ব যুগ যুগ ধরে যা জীবানুভূতির ঘ্রাণ নিয়ে স্পন্দিত হয়ে চলেছে, সেখান থেকেই আসছে সংকেত, শূণ্যতা ভরে দিয়ে যাকে আমরা অক্ষরে সাজাচ্ছি, আমরা অর্থাৎ রিসিভাররা নিশ্চিত করছি তার থাকা। প্রতিটা শব্দ প্রতিটা ধ্বনি দিয়ে আসলে গর্ভক্ষেত্রটিকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি। কিন্তু কতটা জানলে কতটা বুঝলে তাকে সর্বতোপ্রমাণ করা যায়? না, যায় না, আর যায় না বলেই বারবার একটা সমান্তরাল শূন্যতার নির্মিতি হয় বারবার কিছু 'হোয়াইট নয়েজ'' কবির হাতে তুলে দেয় কিছু ন্যাচারাল সিলেকশন, এ সিলেকশন শব্দের মধ্যে থেকে যাওয়া ফাঁকের, অক্ষরের মধ্যে থেকে যাওয়া অভিমানের। এই নীরবতাই তো সখা হয়ে ওঠে শিল্পীর; সার্তে যেমন বলেন - " Silence itself is defined in relationship to words, as the pause in music receives its meaning from the group of notes round it." অর্থাৎ যতক্ষণ না নৈঃশব্দ্যকে তার উচ্চারনের আধেয় করতে পারছেন কবি ততক্ষণ শব্দের শ্রুতির কোলাহলময় কবিতাটির মধ্যে মুক্তির অপেক্ষায় বসে আছে কবির 'কালপ্যাঁচা', কবিতার 'কায়াকল্প'। শব্দের গোযুথকে ছাড়িয়ে বাকের অবরোধকে মুক্ত করে একজন কবির ডাক পড়েছে ঠিক এমনই এক অন্তর্লীন দ্বিতীয় ভুবনে; ফ্লুইড রিয়ালিটির বাইরে কথনবিশ্বের বাইরে ঠিক এখানেই তিনি ওড়াবেন তার মূক ফিনিক্স!

ফিরে আসি সেই বধির চরিত্রটির কাছে, সে অনুকরণ কিভাবে শিখল তবে? কিভাবে শিখল জনারের খেতে হাওয়ার ডাক, কিভাবে জানল রোদ পোহানো ঘুড়ির গল্প! সৃষ্টি আর স্রষ্টার মাঝে একটাই কি কথা বলার জায়গা থাকে- যার নাম শূন্যতা! আর এই শূন্যতাকেই তোমার আমার কাছে ভরিয়ে রাখা হয়েছে কিছু স্টিল লাইফ দিয়ে, আত্মপ্রকাশের কাজে বৃহত্তর মানুষ যাকে বিংগ বলে বস্তু বলে জানছে তাকেই বিশিষ্ট করছে কবি, নাথিংনেসে পরিণত করছে তার স্বাধীন মনোবৃত্তিতে ঘুরে বেড়ানো দেহাতারিক্ত সত্ত্বাকে! দৃশ্যের কাছে শিল্পী বাচাল, বোহেমিয়ান, সে একমাত্র ব্রাউন ডোয়ার্ফ দৃশ্যহীনতার অমোঘ টানে। সেখানেই সে বন্দী।আমি সোম কিংবা ধরা যাক আমরা এ মুহূর্তে কেউ কবিতা লিখিনা কেবলমাত্র একটা কান খুঁজছি স্রেফ একটা কান যার ভেতরে ধারাপতনের মত ধরে আছে কবিতার ঘরবাড়ি। খুঁজছি কবি নামের এক আশ্চর্য্য বধিরকে। আর এই কান খুঁজতে এসে আমরা 'বিশ্বাস' শব্দটার কাছে খানিক জিরিয়ে নিচ্ছি। এই বিশ্বাসের স্তর থেকে বোঝার চেষ্টা করছি 'কবি' নামের শ্রুতি পরিত্যক্ত মানুষটিকে। স্বগত ব্যক্তিসত্ত্বার ভেতর অস্বাভাবিক ব্যক্তিসত্ত্বাটি যে কিনা ঘরের ভেতরটা দেখাবে বলে ঘরের ভেতরে চেতনের ভেতরে কি কি গাছ পুঁতেছে কি কি ফুল তুলেছে কি কি নদী এঁকেছে শোনাবে বলে দেহজ শর্তের বাইরে দ্যোতনা হয়ে রয়েছে। ঝুঁকি নিয়ে রয়েছে একজন কবিকে একজন শিল্পীকে একজন দার্শনিককে সেই বিশুদ্ধ স্পেস অবধি পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেখানে প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করার জন্য কোনো উপস্থিতির প্রমাণ নেই। শব্দ নেই। শ্রুতি নেই। নৈঃশব্দ্যের গনতন্ত্রে দাঁড়িয়ে সিগনেচার থেকে স্বাতন্ত্র্য হওয়ার খেলা কেবল। অর্থাৎ কবিতার ভোকালাইজেশনেই রয়ে গেছে অজস্র সাইলেন্ট অবজেক্ট অজস্র ইনভিজিবল কনট্রাডিকশন- আরতাই চিনতে চাইছে কবি, শূন্যতার সাথে কথা বলতে চাইছে। কেবল স্বরবর্ণগুলোকে উচ্চারণ করলেই দেখা যাবে শব্দের রান্নাঘর থেকে আমরাও ঢুকে পড়ছি নৈঃশব্দের ডার্করুমে, প্রতিটা স্বরবর্ণের উচ্চারনেই রয়েছে একটা অব্যক্ত বৌদ্ধিক শূন্য যেখানে শব্দ কেবল শব্দ নয় দৃশ্যের স্বরূপশক্তি। আর দৃশ্যের তো রয়েছে সিগনেচারের বাইরে একটা ট্রান্সেনডেন্টাল পরিসর একটা মুক্তিকামীতা। যেমন সোম একজন জন্মবধির; এ বস্তুপৃথিবীর সহস্রাধিক শব্দ সে কেবল ভাওয়েল ফিল্টারেশনের মাধ্যমে শুনতে পায় স্বরবর্ণের আদলে, তার কবিতা আমরা যখন পড়ছি-

“ আমি মৃত

আমার ছেলের বাবা জীবিত

আমি মৃত

আমার স্ত্রীর স্বামী জীবিত

আমি মৃত

আমার বাবা- মায়ের একমাত্র সন্তান জীবিত

এবং

এদের কাছে- ই

অমৃত আমি”

সেই একই কবিতা সে কিন্তু হেয়ারিং এড নিয়ে তখন ভাওয়েল ফিল্টারেশনে শুনছে-

“আ – ই ই- ও

আ – আ এ –এ আ – আ ই –ই- ও

আ – ই ই- ও

আ – আ ই (একটু টেনে) আ – ই ই –ই- ও

আ – ই ই- ও

আ – আ আ – আ –আ –এ এ- আ –ও ও –আ

এ- আ

এ- এ আ – এ- ই

অ – ই- ও আ – ই …”

অর্থাৎ আদতে আমাদের অভ্যাসিত প্রতীক বা সিম্বলের বাইরে কেবল স্বরবর্ণ দিয়েই বোধের গতিপ্রকৃতি নিরূপিত হতে পারে, হতে পারে চেতনার হরেক রকম খেলা। শূন্যতা দিয়েই গড়ে উঠছে একধরনের শাশ্বত পূর্ণতা। আর ঠিক এই শুদ্ধতম শূন্যতাতেই তো আমরা কবিকে দেখতে চাই। সেই শ্রুতিশূন্য কবিটিকে, যিনি কিনা আদতে শূন্যতাকেই করেছেন তার ব্যক্তিগত ধ্বনি, যিনি বেশি করে বাজিয়ে চলেছেন না থাকার নিবিড়তমকে। এ বস্তুপৃথিবীর একাধিক সংযোজনে কবিতার দেহভান্ড রচিত হলেও আমি কবিকে একা দেখতে চাই। একেবারে একা। এবং শব্দোত্তীর্ণ। ঠিক যেমন একজন জন্মবধির শূন্যর ভেতর যুগে যুগে

প্রমাণ করতে চাইছে একটা থাকা, নৈঃশব্দ্যই হয়ে উঠছে যার নায়ক, ঠিক সেভাবেই প্রকৃত কবি স্মরনীয়পেক্ষা অস্মরনীয় অশ্রুত সবটুকু শুনবে, না হলে না-শোনাকে শুনবে কীভাবে! সোমের মত যে মানুষটার কোনো কথা বলা কার্ণিশ নেই, কেবল গলা বেয়ে কিছু ধীর শ্লথ গড়িয়ে নেমে আসা তরঙ্গ ভারী হতে হতে ভরাট হয়ে যায়, আর সেই শেষ হয়ে যাওয়া তরঙ্গই নাকি হয়ে ওঠে শব্দ বা কথার এক নিজস্ব ধরনের জীবিত হয়ে ওঠা- ঠিক এখানেই হয়ত লেগে থাকে শিল্পীর ক্রমস্ফীত এক সঙ্গহীনতা, না, এ সঙ্গহীনতা আসলে অসহায়তার নয় বরং এ সেই বধির গৃহে প্রবেশ করার আকুতি, যা শিল্পী শুনতে চায় ধরতে চায় তার প্রথমতায় তার প্রবহমানতায়।

কান সম্বন্ধে বা শ্রুতির গুরুত্ব সম্পর্কে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক তারকোভস্কির একটা নিবিড় জিজ্ঞাসা ছিল এবং সুস্পষ্ট প্রয়োজনও অনুভব করতেন তিনি।বলতেন- ‘‘শব্দ শোনার জন্য নিজের কানকে শিক্ষিত করে তোলো। দ্যাখ, দুধের একরকম শব্দ আছে, জলের অন্যরকম। এসবই প্রাকৃতিক, তাই না? কিন্তু আমরা এইসব জিনিসে নজর দিইনা। একটি ছবিতে কিন্তু এইসব গুরুত্বপূর্ণ। জলের শব্দই ধর। শব্দের কী অফুরান বর্ণালি- সহজ ও নিখাদ সংগীত। আর জ্বলন্ত আগুন তো কখনো কখনো একটা গোটা সিম্ফনি হয়ে ওঠে, কখনো বা একাকী জাপানি আড়বাঁশি। বীচ আর পাইন আলাদাভাবে পোড়ে, সেই গন্ধ ও শব্দ আলাদা রকম...’’- দৃশ্যকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে শব্দকে নিয়ে এমনই ছিল তারকোভস্কির সাবলম্বীতা। প্রায় ২৫০ রকমের শব্দ নিয়ে তাঁর শেষ ছবি ‘দ্য স্যাক্রিফাইস’এর কাজ করেছিলেন তারকোভস্কি। একটি মানুষের কথা বলতে, ভেতরের সুস্থতাকে পুড়িয়ে কাঁটাতারে ঘেরা সুরক্ষিত একটি মানুষকে তার ভারসাম্যের ভাবনা দিতে স্বপ্নের মধ্যে বরফ পড়ার শব্দ থেকে শুরু করে ভারী যুদ্ধজাহাজের শব্দ দানা বাঁধার আগে কাচের বাসনের ভেঙে পরার প্রতিনির্ভর শব্দ অবধি পৌঁছতে চেয়েছিলেন তারকোভস্কি।উপকূলবর্তী এক কাঠের বাড়িতে গ্রীষ্ম কিংবা বসন্তের কিছু কিছু দুপুরে জীবনের তুলনায় আরও জীবিত কিছু মুহূর্তের ছবিটির বেশিরভাগ সাউন্ডট্র্যাক রেকর্ড হয়েছিল। স্রেফ চলা, একটা ভরে ওঠা, একটা সর্বাঙ্গীন জেগে থাকা কিংবা নিখাদ শূন্যতাকে বোঝাতে কাঠের মেঝের ওপর বিভিন্ন মাপের জুতো (এমনকি মহিলাদের ৪৫ সাইজের জুতোও) পড়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন মূল শব্দ- সংগ্রাহক Owe Svensson। সম্পূর্ণ ছবিটিতে শব্দের কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই, কেবল বেড়ে ওঠা আছে। সম্পূর্ণ ছবির প্লেব্যাক ডেকে সংলাপ ছাড়া শুরুর দিকে একটি মহিলার ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে নেমে আসা তীব্র কন্ঠস্বর এবং শেষে আড়বাশিঁর কিছু টহলদারী ছাড়া সংগীত সে অর্থে নেই অথবা সংগীত আছে শব্দের শষ্যক্ষেতের ওপর ঘুমিয়ে। তারকোভস্কির শেষ ছবি ছিল ‘দ্য স্যাক্রিফাইস’। ফুসফুসে প্রাণঘাতী ক্যান্সার ততদিনে সনাক্ত হয়ে গেছে। সুইডেনের আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে প্রিয়তার কণিকাগুলি, উড়ে যাচ্ছে জয়ী পরাজয়ী মানুষের স্মৃতিখননগুলি আর কোনো এক সুইডিশ জনারখেতের ওপর চলছে ছবির শেষ দৃশ্যের শুটিং। প্রৌঢ় অভিনেতা ও দার্শনিক আলেকজান্ডার যে কিনা বেঁচে থাকার ইলিউশনকে ভাঙতে, বস্তুগত জীবনের ভার কমাতে নিজের বাড়িটি পুড়িয়ে দেন, শেষ দৃশ্যে কেবল একা দাঁড়িয়ে তারই পোঁতা নিষ্প্রত্র গাছটি। তার গোড়ায় জল দিয়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে তাঁর ছয় বছরের পুত্র প্রথম কথা বলে ওঠে। কোনো এক পক্ষীনিবাসে এ শুটিং। চারিদিকে পাখিদের হ্যামলেট; পাখিদের প্রত্নসন্ধান। আর তার মাঝেই তারকোভস্কি ক্যামেরায় চোখ রেখে তার সহকারীকে বলে উঠলেন- “You know, Owe, in the end we must hear no birds”। বাকের কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্র ফাঁস করতে তবে কি নির্বাকের কাছেই শেষতম আশ্রয় চাইলেন তারকোভস্কিও! নীরবকে দিলেন প্রকৃত নির্ণায়কের ভূমিকা?

অর্থাৎ যে মূর্হুতে শিল্পীর শব্দকে কমপেনসেট করছে শিল্পীর নৈঃশব্দ্য সে মুহুর্তেই সে এক আশ্চর্য্য বধির, সে মুহুর্তেই জুতো খুলে তার দিকে এগিয়ে আসছে শব্দের একধরনের কনটিন্যুয়াস সেলফ মডেলিং। একটা ধারাবাহিক গমনধ্বনি। শব্দের সবটুকু সূক্ষ্মরেখাকে গিলে ফেলছে স্বপ্ন আর সুযুপ্তির বাকিটুকু। তৈরী হচ্ছে নতুন এক পারসোনালিটি সাবওয়ে। এটা হচ্ছে আনকনসাস আর সেলফ কনসাসের দ্বন্ধ। ইয়ুং তাঁর 'সাইকোলজি অফ আনকনসাসনেস'এ যে হিরো- ওরসিপের কথা বলছেন সেখানে একটা প্রিডিটারমাইন্ড ধারনা বা কল্পনা সবাইকে গিলে বসে রয়েছে আর সেখান থেকেই কেউ কেউ খাঁচা খুলে বেরিয়ে আসছে খুবলানো চিন্তাংশ নিয়ে দানা নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। লয় হতে চাইছেনা তারা। প্রকৃতির দ্বারা গ্রস্থ হতে চাইছেনা, বরং জীবত্ব থেকে বেরিয়ে শিবত্বের দিকে রওনা দিচ্ছে বস্তুর সর্বস্বকে নির্বিশেষ বদলে দিয়ে। এখানে দাঁড়িয়েই আমাদের কাছে দুটো উপাত্ত উঠে আসে। এক- শরীর ঘুরে ঘুরে হাত ঘুরে ঘুরে অন্তরেন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে রেখে অনুভাবিত সংস্কার থেকে শিখে নাও কবিতার স্বদেশভূমি অবধি যাওয়া অর্থাৎ বৃষ্টির বড় হওয়াকে বল টুপটুপ অথবা ঝরঝর, পাতার নড়াকে বল শরশর অথবা পতপত, মেঘের ঘরে ফেরাকে বল গমগম অথবা গুরগুর- আর দ্বিতীয় পথটি হল কৈবল্যের পথ। বাইরের জগত থেকে বিকিরত হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ার পথ। সেখানে নির্দিষ্ট কোনো আকর নেই কেবল জগতকে একটা ছোট্টো ধাক্কা দিয়ে অন্তর্জগতে তলিয়ে দেওয়া আর সমর্পিতকে ঠেলে দেওয়া অজানা এক অসমর্পিত আনন্দের দিকে। এখান থেকেই আমরা অস্তিত্ব শব্দটাকে কেটে আবির্ভাব লিখে ফেলতে পারি। এবং এই আবির্ভাবের মধ্যে শব্দকে আমরা ঘরে না ফেরাতেও পারি, ধুয়ে নাও দিতে পারি তার কাদামাখা দৈনন্দিন পোষাকআষাক। মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে দিতে পারি তার সারাদিনের অনুসরণ। অর্থাৎ বৃষ্টিকে সেখানে তুমি রক্তমাংসের ভাবতে পার, মেঘকে ভাবতে পার নিভু নিভু আলোর মত কাঁপতে থাকা দ্বিমেরু বিশ্বের কোনো এক ঘরহারা মানুষ। তবে তার শব্দ কেমন হবে? একটি বৃষ্টি বা একটি মেঘের শব্দ তাহলে সে মুহুর্তে কেবল একটি শব্দ না বরং শূন্যতার সংকেত। হতেই পারে দু পা চলার পরে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার শব্দ কিংবা ক্ষীণ নতজানু আকার নিয়ে পড়ে থাকা ছায়ার শব্দ!

রবীন্দ্রনাথ তো বলেইছেন- "প্রথমে দেখছি আমি আছি— আমি সত্য। তার পরে দেখছি যেটুকু এখনই আছি এইটুকুতেই আমি শেষ নই। যা আমি হব, যা এখনও হই নি তাও আমার মধ্যে আছে। তাকে ধরতে পারি নে ছুঁতে পারি নে কিন্তু তা একটি রহস্যময় পদার্থরূপে আমার মধ্যে রয়েছে। –('সমগ্র এক") "- এই পরম অদ্বৈতের চেতনার ভূমিতেই তো কবি দাঁড়িয়ে, শব্দের মুটে বইতে বইতে খুঁজে চলেছে বাইরের আবছা থেকে ভেতরে নৈঃশব্দের সত্যটুকু। বাইরের সরব থেকে ভেতরের নীরবের সন্ধানটুকু। বাক সেখানে বিজ্ঞানকে স্ফূর্ত করলেও নির্বাক সেখানে নিশ্চয়তা দিচ্ছে সম্ভাবনার। আর সেই তো কবির নিজ ভূমি নিজ গৃহ যেখানে বারবার ভুলে যাচ্ছে বাড়ি ফেরার রাস্তা। বারবার শূন্যতার ফকিরি গ্রহণ করে গেয়ে উঠছে –

" সবদের ঘর নিসব্দের কুড়ে- সদাই তারা আছে যুড়ে- দিয়ে জীবের নজরে ঘোর টাটীঃ ।।

আপন ঘরে পরের কারবার আমি দেখলাম না রে তার বাড়িঘর,

আমি বেহুষ মুটে কার মোট খাটীঃ ।।"

In the shadows he could just make out a rough, ghostly wall that stood out in the pitch darkness. As if drawn by an irresistible black beacon, he slowly advanced step by step towards that incandescent wall of shale. Far off, the city was vanishing into the air. The fiesta disappeared somewhere beyond his eyelids. The wall was increasing in size, growing amidst a mixture of shadows and sparks. It was a wall of smoke from which sprouted candles that resembled asteroids. In fact, it was not one wall but two. Two tall, crackling walls, silently burning. But it wasn't two walls either. It was, in fact, a street.

Eugenio Fernandez Granell

ইংরেজী কবিতা

BIDISHA FOUZDAR

RUMINATIONS OF A PARK FLOWER

i want you
to sit me down
one evening, beneath that
sad park tree, on the bench where we
spent our doubts and made such attempts
as can be made
at charm

then, slowly, i want
you
to peel my skin off, layer by utmost layer
and then, when the onion is no more
take those peelings
my offering
to the compactness,
boundaries and that separateness
that kept you whole

and spread them to the evening winds

then bundle up the stories
that i stood for
- uncivil, random, silverfish-
gut them
of the inconvenience they translated into

and dig them a grave
beneath a construction site
in Lower Parel

i imagine some wretched gust
of methane, born of their organic rot
may snatch up their desperate sadness
and a whiff of psychedelic grief
touch your urbane
self
with my otherness, those parts
that are

insolently, still,
not you

অনুবাদ কবিতা

PABLO NERUDA: WALKING AROUND

অনুবাদ: দিলীপ ফৌজদার

(পাবলো নেরুদার জন্ম ও যাপন দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে । ইস্কুল কলেজের কালে নাম ছিল নেফতালি রিকার্ডো রেয়েস বাসওয়ালতো । এই সময়টা (১২ জুলাই ১৯০৪ – ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩) শুধু চিলি কেন, দক্ষিণ আমেরিকার সমগ্র এই অঞ্চলটাই প্রথমে ছিল একটা অন্ধকার, বিচ্ছিন্নতা কবলিত মহাদেশ । ল্যাটিন আমেরিকা এই পরিচয়ে এখনো বিশ্বের দরবারে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ এই ভূখণ্ড । ফরাসী দার্শনিক আঁদ্রে মলরো দেখেছিলেন প্রতি ৫০০ বছরে বিশ্বে একটা বড়ো রকমের ফেরবদল ঘটে যায় এবং ১৯৫০ সালটিকে তিনি এই ফেরবদলের একটা মাইলফলক মেনে নিয়ে ছিলেন । ১৯৫০ সালটির কাছাকাছি সময়েই এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা সহ দক্ষিণ জগতের দরিদ্র, অবহেলিত দেশগুলি জেগে উঠেছিল কলোনিয়ানার অন্ধকার ঘুম থেকে ।

পাবলো নেরুদা অল্প বয়স থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন ও পিতা এতে সায় দিতেন না - চেয়েছিলেন ছেলে পড়াশুনা করে উপার্জনক্ষম হোক । পিতার নজরের বাইরে যাওয়ার জন্যই তরুণ এই কবি যে ছদ্মনামটি নিলেন সেটিই তাঁকে বিশ্বের দরবারে পাকাপোক্ত ভাবে ধরে রাখল । পাবলো নেরুদা এই নামটি তিনি নিজের জন্য বেছে নিলেন বিখ্যাত চেক লেখক ও কবি ইয়ান নেরুদার নাম থেকে ।অল্প বয়সেই সুররিয়্যালিস্ট কবিতা লিখে কবিপরিচিতি

পান । ১৯২৪ সালে যখন মিলিটারীরা চিলির শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয় তখন নেরুদা ২০ বছরের তরুণ কবি । তার পরের বছরগুলিতে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা এসেছিল দেশে । নেরুদা এই সময়টায় বাম রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে যান । তাঁর কবিতায় দেশের দুর্বল সমাজের সপক্ষে একটা স্পষ্ট প্রতিবাদ ফুটে ওঠে । দুটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করা যায় : ১৯৪৫ সালে ব্রাজিলের সাও পাওলোতে সেনেটর ও কম্যুনিস্ট বিপ্লবী নেতা লুই কার্লোস প্রেস্তেসের সম্মানে এক লক্ষ মানুষের সমাগমে পাবলো নেরুদা কবিতাপাঠ করেছিলেন । ততদিনে নেরুদা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে পুরোপুরি ঢুকে পড়েছিলেন । ১৯৭১ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর আরেকবার ৭০,০০০ শ্রোতার সমাগমে নিজের দেশ চিলিতে তিনি কবিতা পড়েন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আলেন্দের আমন্ত্রণে । জীবনে বেশ কয়েকবার কূটনীতির পদে থেকেছেন দেশের স্বার্থে । অল্পকাল থেকেছেন চিলিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির সেনেটরের পদে । পরবর্তীকালে বিপক্ষীরা ক্ষমতায় আসায় অত্যন্তই এক বিপজ্জনক যাত্রাপথ পেরিয়ে আর্জেন্টিনায় পালিয়ে যান; ফিরে আসেন কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা পুনর্দখল করায় । এ ধরনের সক্রিয় রাজনীতি করার অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে নানাভাবে । ১৯৭৩ সালে যখন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শেষবার সে সময়টা চিলি রাজনৈতিক উথালপাথালে গুরুতর ভাবে আহত । কয়েকদিন আগেই রাষ্ট্রপতি আল্লেন্দেকে রহস্যাজনক ভাবে হত্যা করা হয়েছে ও অগাস্তো পিনোচেট দেশের ক্ষমতা জবরদখল করে নিয়েছেন । হাসপাতালে আসার তিন দিন পরে নেরুদা মারা যান । ক্যান্সার হয়েছিল ।)

হাঁটাহাঁটি

এমন হয় যে নিজেকে মানুষ ভাবতে ঘেন্না হয় ।
আর এটাও হয় যে চলে যাই দর্জির দোকানে সিনেমাঘরগুলোতে
শুকোনো, জলনিরোধী, যেন একটা শোলায় গড়া হাঁস
আমাকে নিয়ে সাঁৎরে বেড়াচ্ছে জন্ম ও ভস্মের জলে ।

নাপিত ঘরের গন্ধ নাকে এলে মনে হয় চেঁচিয়ে কেঁদে উঠি
একান্তই যেটা চাই তা হোল নিস্পন্দ শুয়ে থাকতে পাথরকুচির মতো ঊলের মতো
একান্তই যেটা চাই তা হোল আর দোকান দেখে না বেড়াতে, আর বাগিচা নয়,
আর মাল না, আর চশমা নয়, চলন্ত সিঁড়িগুলোও না ।

এমন হয় যে নিজের পা দুটো আর নোখগুলোতেও বিরক্ত হই

অম্নিই হয় আমার চুল নিয়ে নিজের ছায়াকে নিয়েও ।
এমন হয় যে নিজেকে মানুষ ভাবতে ঘেন্না হয় ।

তবুও দারুন হয় যখন
একগোছা শাপলা নিয়ে পৌঁছাই মোক্তারবাবুর কাছে আর তিনি আঁৎকে ওঠেন,
ধর্মযাজিকার কানে ফুঁ দিয়ে তাঁকে মেরেই ফেলি ।
দারুন হয় যখন
রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াই হাতে একটা সবুজ ছুরি নিয়ে
মুখ দিয়ে বেরোতে দিই উল্লাস যতক্ষণ না মারা পড়ি তুষারহিমে ।

এমনি আর থেকে যেতে চাইনা অন্ধকার একটা শেকড়ের মতো,
অসুরক্ষিত, টানজর্জরিত, নির্ঘুমে কম্পমান,
নেমে যাচ্ছি তলায়, মাটির আর্দ্র গভীরতায়,
নিশ্বাস টানছি আর ভাবছি, খাচ্ছি এক একটা দিন ।
এত ভোগান্তি আমি আর চাইছি না ।

আমি আর এগোতে চাই না শেকড়সুলভ, কবরের দিকেও না,
একা একা মাটির তলায়, মৃতদেহদের সঙ্গে একটা গোদামঘরে,
আধা হিমায়িত, শোকে মুমূর্ষু ।

এ জন্যই তো যখন সোমবার আমাকে আসতে দেখে,
দেখে আমার আসামী চেহারা, জ্বলে ওঠে সে দাহ্য গ্যাসের মত
তাড়িয়ে বেড়ায় আপন সারাপথ যেন একটা আহত চাকা,
তারপর ফেলে যায় লীক গরম রক্তের রেখা টানা হয় রাত্রি উপরান্তে ।

আর ওটা আমাকে কোণঠাসা করে কটা কোণায়, ঠেলে ঢোকায় কটা স্যাঁৎসেঁতে ঘরে,
ঠেলে দেয় হাসপাতালে যেখানে হাড্ডিরা জানালা গলিয়ে উড়ে চলে,
জুতোর দোকানগুলিতে ঢোকে সেখানে ভিনিগারের মত গন্ধ,
আর ত্বকের ফাটলদের মতো কোন কোন কদাকার গলি ।

যখন দেখি গন্ধক রঙা পাখিদের ও তাদের কুৎসিৎ যকৃত
টাঙান থাকতে দরজায় দরজায় – ঘেন্না হয়,
আর যেখানে কফির পাত্রে কেউ ভুলে ফেলে যায় বাঁধান দাঁতপাটি,
দূরান্তের আয়নারা যারা নির্ঘাত কেঁদেছিল লজ্জায়, ভয়াবহতায়,
সর্বত্রই দেখি ছত্রছাওনি, আর বিষ, আর জন্মনাড়ি ।

আমি চলতেই থাকি প্রশান্তিতে, সঙ্গী আমার দুচোখ, আমার জুতোজোড়া,
আমার রোষ, ভুলে থাকি বাদবাকী যাবতীয়,
আমি হাঁটি, পেরিয়ে যাই দপ্তরের দালানবাড়ি আর হাড়ডাক্তারীর দোকানগুলো,
আর চাতালগুলো যেখানে তারে টাঙানো সারি সারি:
অন্তর্বাস, তোয়ালে ও জামা যেগুলো থেকে
ঝরে যেতে থাকে ময়লা অশ্রু ।

পাঠ প্রতিক্রিয়া

স্বপ্নের
সন্ধিক্ষণ

সূর্যাস্তের সঙ্গদোষ (কাব্যগ্রন্থ) : অগ্নি রায়
প্রকাশক: ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা
প্রচ্ছদ: সোমনাথ ঘোষ
মূল্য: ৭৫ টাকা

এ এমন একটা সময় যখন মধ্যরাতের বাস টায়ারের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যায়, গাছেদের বাবা মা ব্যাগপ্যাকের কাছে নিরাপত্তা খোঁজে, লুডো খেলার অবাধ্য রতির পাশে কামনার খালাসি বুঁদ থাকে ফেলে আসা ঘর গেরস্থালির শূন্য ভিতের আস্বাদনে। কবিতা ফবিতা সব পাল্টে যাচ্ছে - কোনো অভিধার ব্র্যাকেটে ধরে রাখা যাচ্ছে না উপচে পরা কবিতাশরীর ; সিনট্যাক্স, প্রতীক, বোধ, বিষয় - বিষয়হীনতা, না বিষয় কিম্বা নির্মাণ- বিনির্মাণের মোহময় শব্দগুলিও ক্রমশ বাতিল / খারিজ ! এ এমনি এক বিকেলের কথা যেখানে কমলাবল ড্রপ খেতে খেতে গড়িয়ে যায় অন্ধ রাত্রির দিকে; জড়তা জন্মান্ধ জানে সমঝোতা অহরহ ;
প্রিপেইড বিরহ জেগে থাকে প্যাঁচার মতো ; বাসি জামাকাপড়ে হিমের সাবানে আসে হেমন্ত ; নূপুরের অহিফেনে বর্ষা নাচে। কবি অগ্নি রায়ের কথা বার্তা আলাপ সবই সেইসব চিনির পরমাণু ছড়ানো বিস্কুটদের নিয়ে যারা শৈশবেই শ্রেণীচেতনার জন্ম দেয় ; দরিয়াগঞ্জ, মোমিনপুর শুধুই তামাসা। অগ্নির কবিতাবলী, কবিতা পংক্তির স্বাচ্ছন্দ পায়চারী মরুপ্রাসাদের নিরানন্দ উটবাহিনীর সাথে, মতস্যপুরাণের বেপরোয়া আচমনে, বনবাংলোর রোদছাতা অরণ্যে। কবির কব্জির জোরে ভেটকি, শুঁটকি এবং চারাপোনাও কাব্যগন্ধী হয়ে ওঠে। আবার ঘষাকাঁচ- আয়না সময়ে প্রেমের মুখও কখনো মনে হয় দীর্ঘ রেলযাত্রার মতো ক্লান্তিকর - অসুস্থ বোতাম আলগোছে খসে পরে একদিন .... আর এভাবেই কবিতা থেকে কবিতান্তরী হতে হতে রবীন্দ্রসংগীতের এসরাজে মডার্ন স্মার্টফোন যাপিত চিত্রকল্প ঠিকরানো সার্জিক্যাল ক্যালপোলে মুক্তি পায় আলোয় আলোয়, কবির স্বপ্নে সেই রাত অধিলৌকিক স্পর্শতা পায়, যে রাতে দুয়ারগুলি ভাঙে না - বরফের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়িয়ে পরে..... আর এভাবেই ক্রমশ জলপরার মৃদু আশ্লেষে আমাদের পাঠচেতনাকে সম্পৃক্ত করে।

-- **কৃষ্ণা মিশ্রভট্টাচার্য**

Shunyakal porlam. Prachesta bhalo. Kata sankhya bariechhe. Kabe kabe patrika barochchhe. Lekha deoyar niyam ki?
Arundhati Sengupta

শূন্যকাল আরো গহন হচ্ছে। পাঠবস্তু বাড়ছে, বৈচিত্র বাড়ছে আরো আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে ছবি সহকারে। চালাও পানসি।
বারীন ঘোষাল

Chamatkar hochchhe Dipankar. Odhikangsho kobitai besh valo-onnorakam. Monojog o anuvab dabi kore, bodher govir theke uthe esechhe. Sakalbela ete porar por monta alo hoye gelo.....
Dhiman Chakraborty

ভরাটকাল। এ তো দেখছি বিশাল ব্যাপার হে । কেবল চোখ বোলাতেই ঘণ্টাখানেক লেগে গেল । ওয়েব ম্যাগাজিন তো দেখছি পাশাপাশি, কিন্তু তোমার নেটপত্রিকার মতন বিস্ময়- জাগানো তো এখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না । সময় করে পড়তে হবে ।
ভালো থেকো ।

শুভেচ্ছাসহ
মলয় রায়চৌধুরী

First of all, I must say that the concept of blending the poems and relevant pictures is really unique and appreciable. Poems are good but some of them are too long and that brings a monotonic sense. Nevertheless, the e-magazine attracts attention.
Arka Sengupta

Sri Dipankar Dutta,
Namaskar. Amake 'Shunyakal' parar sujog debar janya dhanyabad. Ek jhalak porlam. Khub-e akarshak. Rabindra Guha, Barin Ghosal ami pelei pori. Debjani Basu o ei lekhagulo te valo lagalen. Ami chhabi samparke avimat byakto kori na, kintu dekhi. Lal malat sada nam 'Dipankar Dutta-r kabita' foreword Ajit Ray, apnar ? valo legechhilo, mone achhe. Apni ki 80 dashaker?
Suvechchha.
Moulinath Biswas

Congratulations!!!... thank you.
With Regards,
Mrinmoy Pramanick
UGC-Junior Research Fellow (Ph.D.)
Centre for Comparative Literature
School of Humanities
University of Hyderabad

I need to read all of them. Carry on Brother. Wish u good luck.
Uday Shankar Durjay

Shunyotar ki bhalo mondo achhey ? Tar to ostitto nei. Ostitto na thaka niei tar karbar, bhalo jomechhey

byaparta. Debjani Basu key jantey ichchhe korchhey. Tar lekha besh sira uposira dhorey dourochchhey. Ini kon kaler ? Kon sokaler ?
Alok Kumar Basu

লেখা ভালো লাগছে। হেটারোসেক্সুয়াল দিন দারুন। আর সাজানো মানে ছবিগুলো ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে একটা ঐতিহ্য ধরে আগানো। সব্যসাচী হাজরা, গোলাম রসুল উনাদের লেখা ভালো লেগেছে। সুন্দর কাজ। ধন্যবাদ সকলকে।
বাবুল হোসেইন

ফেসবুকে শেয়ার করলাম।
Sazzad Qadir

শূন্যকাল ও দীপঙ্কর দা দু'জনকেই শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই।
লেখা পড়ে ভীষণ ভালো লাগলো। সঙ্গে থাকার তাগিদ অনুভব করছি। সঙ্গে থাকবো. . .
সুমন মল্লিক

অসাধারণ লাগলো, আগামি দিন আরো হোক এই প্রত্যাশা
রাজীব ঘোষ

প্রিয় সম্পাদক,
আবার একটা সুন্দর সংখ্যা উপহার দেবার জন্য ধন্যবাদ। মনোযোগ দাবি করে কিছু কবিতা, কিছু শব্দবন্ধ দাগ কেটে গেল।
সমস্তটা এখনো সময় নিয়ে পড়ে উঠতে পারি নি। আশা করছি এই কয়েকদিনের ছুটি কবিতাগুলো নিয়ে ভালো কাটবে !
শুভেচ্ছা সহ,
শুভাশিস ভট্টাচার্য

Khub Bhalo. Chamotkaar hoyechhe.
N Julfikar

শূন্যকাল বেশ ভাল হয়েছে দীপঙ্কর। এত সব কবিতা। মাঝে মাঝে দারুন সব পেন্টিংস। ভয়ংকর ভাল। সম্পাদনার কাজটিও সুচারু। চালিয়ে যাও। দীপঙ্কর কে পাওয়া যাচ্ছে। সাধু সাধু।
উমাপদ কর

Dhanyabad Dipankar. Natun bachhor valo hok.
Pranab chakraborty
Nabadwip

Bes sundar.
Dibakar Das

Thanks! Udyog prosongsoniyo, bhalo laglo dirgho kobitati khub sundar ! Notun bachhorer sera upohar.
Inasuddin Md

Valo. Chhobi gulo khub valo. Apnader postal add janan. Amar boi o patrika pathabo. Valo lagle punarmudran korben ?
Ritwik Tripathy
Jaladarchi
Midnapore

গুচ্ছ। ছিটে শ্যাওলায় মরচে ধরা নস্যির মত পালিঙ্কা ! ওস্তাদ, হেব্বি মস্তিতে লাট।
স্ট্রং সাইলেন্সার যুক্ত অ্যাসাইলাম। হোক, আরো বুলবুলি ও স্থূল পদ্মের মত জোড়ায় স্তন।
karubasona
9748747487